মনোজ্ঞ, কখনও [illegible] [illegible] [illegible] বিষাদ, ভক্তি [illegible] এবং যুক্তিবাদী ধর্মবুদ্ধির সঙ্গে তার সংমিশ্রণ ঘটেছে। [illegible] [illegible] হয়, এমন একটি যৌগিক রীতির মাধ্যমে তিনি বিশ্বাসী মানবজীবনের সর্বকর্ম-চেতনার [illegible] প্রতিফলিত করে যাচ্ছে। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর এই অন্বেষা [illegible] [illegible] পর্যায়ে বিভক্ত। আত্মার পরম-আশ্রয়ের সন্ধান লাভের জন্য সর্বক্ষণ তিনি অন্বেষণ চালিয়ে গিয়েছেন। ধর্মতত্ত্ব এবং রসতত্ত্বের তাতে অসাধারণ সমৃদ্ধি ঘটেছে।

এমন কোনো ভাষায় লাগেরকভিস্ট যদি তাঁর সাহিত্যরচনা করতেন, পশ্চিমী পাঠকসাধারণের কাছে যা খানিকটা সহজায়ত্ত, তবে যে তিনি এ-যুগের অন্যতম সর্বজনস্বীকৃত চিন্তানায়কের সম্মান লাভ করতেন, তাতে সন্দেহ নেই। এই [illegible] অন্ধকারের থেকে যাঁরা আমাদের পথ দেখিয়ে অন্য কোনো মহত্তর লোকে নিয়ে যেতে পারেন, এমন লোকের সংখ্যা খুব অল্প। [illegible] [illegible] [illegible] অল্পসংখ্যকদেরই অন্যতম। [illegible] মানবজন যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হচ্ছে, নিজেকে তার থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন করে রাখেননি। [illegible] [illegible] [illegible]-গ্রন্থখানির থেকেই সে কথা উপলব্ধি করা যাবে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জীবনদর্শনের প্রতি প্রখর বিশ্বাসেও আমাদের এই সমস্যার [illegible] তিনি পরিচিত। এ-সমস্যা যে কতখানি সর্বনাশা, তাও তিনি জানেন। [illegible] [illegible] দুর্জ্ঞেয় রহস্যের সঙ্গে, এবং যে অন্ধবুদ্ধি নিয়ে এই বিশ্বপ্রকৃতির [illegible] [illegible] সমস্যাগুলিকে আমাদের বিচার করতে হয়—তারও সঙ্গে, এখানে তিনি মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

তাঁর এই বর্তমান গ্রন্থখানি এক [illegible] রসে আপ্লুত। আত্মার [illegible], বিশ্বাসের আলোড়নে এবং মানবমনের অপ্রশান্তির সঙ্গে নিশ্চিত [illegible] মানবজীবন এবং তার নিয়তির এক আশ্চর্য রহস্য এখানে উদ্ঘাটিত হয়েছে। মানুষের মৌলিক জীবন-নাট্যের অন্তর্নিহিত বিরোধ এবং মুমূর্ষু মানব-[illegible] আর্তনাদ এখানে সমান পরিস্ফুট। মৃত্যুর মুহূর্তে সে তার আত্মাকে এক [illegible] অনিশ্চয়ের হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছে।

আপাতত এই 'বারাব্বাস'-ই লেখকের সর্বশেষ বই। শিল্পকর্মের দিক থেকে

এ-বইয়ে এক চূড়ান্ত উৎকর্ষের সন্ধান পাওয়া যাবে। এ-বই সঙ্কেতে সমৃদ্ধ, নিষ্ঠায় বলিষ্ঠ, আঙ্গিকে নিরাভরণ।

পার লাগের্কভিস্টের নিজস্ব চিন্তাধারা এখানে তার শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেচে। এ শুধু নিছক একখানি সাহিত্যগ্রন্থই নয়; সমকালীন ভাবনাবুদ্ধি এখানে এক দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তু-শরীর লাভ করেছে।বললেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না।

—লুসিয়ঁ ম্যরী

আঁদ্রে জিদ-এর চিঠি

প্রিয় লুসিয়ঁ ম্যরী,

পার লাগের্কভিস্টের 'বারাব্বাস' পড়লাম। এ-একখানি অসাধারণ বই। প্রকাশিত হবার আগেই বইখানা তুমি আমাকে পড়তে দিয়েছ, তার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। এই লেখকের 'দী ডোয়ার্ফ' বইখানাও তুমি আমাকে আগে-আগেই পড়িয়েছিলে। গত বছর সমালোচক ও জনসাধারণের কাছ থেকে সে-বই উচ্ছ্বসিত সম্বর্ধনা লাভ করেছিল। সে কথা আমার মনে আছে।

'বারাব্বাস'-এর অনুবাদ যখন তুমি আমার হাতে তুলে দাও, বইখানা সম্পর্কে তখন খুবই প্রশংসা করেছিলে। আমারও তাই বইটি পড়বার জন্যে খুব আগ্রহ হয়। কিন্তু এ-বই যে আমাকে এতখানি মুগ্ধ করবে, তা আমি তখন ভাবতেও পারিনি। গত এক মাসকাল আমি 'লিস্তোয়ার দে লা অরিজিন দু ক্রিস্তিয়ানিজ্‌ম্' (খ্রীষ্টধর্মের জন্ম-ইতিহাস) পাঠে নিমগ্ন ছিলাম, সুতরাং এ-বই পাঠ করবার জন্যে মন আমার একরকম তৈরী হয়ে ছিল বললেই হয়। এ-এক অপূর্ব যোগাযোগ। প্রায় দৈব। এ যখনকার কথা, খ্রীষ্টীয় মতবাদের তখন শৈশবাবস্থা চলছে। পুনরাবির্ভাব-তত্ত্বের সত্যতা প্রমাণের জন্যে তখন এমন

কয়েকজন মাত্র বিশ্বাসপ্রবণ খ্রীষ্টানুসারীর কথার উপরে নির্ভর করতে হচ্ছে, সংস্কার এবং প্রত্যয়ের মধ্যে তখনও পর্যন্ত যাঁরা সেতুবন্ধনে সক্ষম হননি। তাঁদের কথা সত্য কি না, অন্যান্যদের মনও তা নিয়ে সংশয়চঞ্চল। এই যে পরিবেশ, এরই মধ্যে মানুষের মন তখন ধর্ম-সমস্যার এক অদৃষ্ট আলোড়নে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। আর সেই বিক্ষোভের মধ্যেই জন্মলাভ করছে এক নূতন চেতনা। এই নবচেতনার ছন্দোময় রহস্যকে পার লাগের্কভিস্ট সংযম-শাসিত এক অপূর্ব আঙ্গিকের সাহায্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। এবং এর তাৎপর্য যে কত ব্যাপক, সম্প্রতি রনাঁর গ্রন্থপাঠের ফলেই তা উপলব্ধি করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

প্রিয় ম্যরী, যীশুখ্রীষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হবার পর বারাব্বাসের মানসিক অবস্থার উপর তার যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, লেখক যে তাকে এতখানি দক্ষতার সঙ্গে এখানে বিবৃত করতে সক্ষম হয়েছেন, তোমার কথার থেকে তা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। দস্যু বারাব্বাস গল্গথায় যা দেখেছিল—দেখেছিল বলেই তার বিশ্বাস—তার সঙ্গে এবং খ্রীষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করার পরেই লোকমুখে অলৌকিক যে-সমস্ত গুজব ছড়িয়ে পড়ে তারও সঙ্গে বারাব্বাসের মানসিক বিক্ষোভকে যে এখানে এত নিবিড়ভাবে যুক্ত করে দেখানো হবে, তা আমি কল্পনা পর্যন্ত করিনি। মানবতার ইতিহাসে যীশুখ্রীষ্টের মৃত্যুকে এক অত্যন্তই তাৎপর্যময় ঘটনা হিসেবে গণ্য করা যায়। তখন কেউ বুঝতে পারেনি যে, মানবতার ভবিষ্যৎ একদিন বিশেষ এই একটি ঘটনার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হবে।

বস্তু-জগৎ এবং বিশ্বাসের জগৎ—এ দু'য়ের মধ্যে এক অন্ধ গহ্বরের ব্যবধান। আর এক সূক্ষ্ম রজ্জুর সাহায্যে সেই ব্যবধানের উপরে সেতু রচনা করা হয়েছে। লাগের্কভিস্ট যে সেই সেতুর উপর দিয়ে অগ্রসর হবার সময় কিছুমাত্র ভারসাম্য হারাননি, এ বড় প্রশংসার বিষয় এবং এরই কষ্টিপাথরে তাঁর সাফল্যের মূল্য নিরূপণ করা যেতে পারে। বইখানির শেষ বাক্যটি দ্ব্যর্থবোধক; লেখক নিশ্চয় ইচ্ছে করেই তাকে দ্ব্যর্থবোধক রেখেছেন। বাক্যটি এই: "সে যখন বুঝতে পারল যে-মৃত্যুকে সে সর্বক্ষণ ভয় করে এসেছে, সেই মৃত্যুই এবারে সমাসন্ন, অন্ধকারের মধ্যে সে তখন বলল, 'তোমার হাতেই আমার আত্মাকে আমি সমর্পণ করলাম।'

মনে হলো যেন সেই নিবিড় তমিস্রার সঙ্গেই সে কথা কইছে।" এখন এই 'মনে হলো যেন' বাক্যাংশটি আমাকে একটু ভাবিত করে তুলেছে। বস্তুত সে কি তখন নিজের অজান্তে যীশুখ্রীষ্টের সঙ্গেই কথা কইছিল? গ্যালিলির সেই লোকটি কি শেষ পর্যন্ত 'তাকে পায়নি'? জুলিয়ান দী অ্যাপস্টেটেরও সেই একই কথা।

প্রিয় ম্যরী, তোমার কথাই ঠিক। এ-দ্ব্যর্থ মূল গ্রন্থেও বর্তমান। সুইডিশ ভাষা যে অমূল্য সাহিত্যসম্ভার আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে, এখনও দিচ্ছে, তাতে করে বলা যায় যে, প্রতিটি মানুষকেই একদিন এ-ভাষা শিক্ষা করতে হবে। তা নইলে তার শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে না। ইউরোপীয় সাহিত্যক্ষেত্রে সুইডেন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে বলেই আমার মনে হয়। সে-ভূমিকার তাৎপর্যকে যেন আমরা ঠিকমত উপলব্ধি করতে পারি।

—আঁদ্রে জিদ্

ক্রুশের গায়ে কীভাবে তাঁদের বিদ্ধ করা হয়েছিল, এবং কারাই বা তাঁর চারপাশে এসে সমবেত হয়েছিলেন তখন, সবাই তা জানেন। দাঁড়িয়েছিলেন মাতা মেরী, মেরী ম্যাগডালেন, ভেরোনিকা, সিরীনের সাইমন আর এরিমেথিয়ার যোশেফ। সাইমন তাঁর ক্রুশটিকে বহন করে নিয়ে এসেছিলেন। যোশেফ তাঁর শবদেহকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করে দেন। ঢালু প্রান্তরের একপাশে, আর একটু নীচে, আর-একজন লোকও দাঁড়িয়ে ছিল; মাঝখানের ক্রুশটিতে বিদ্ধ মৃত্যুপথযাত্রী লোকটির উপরে তার দুই চক্ষু নিবদ্ধ। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সে তাঁর মৃত্যু-যন্ত্রণা দেখে গিয়েছে। লোকটির নাম বারাব্বাস। তাকে নিয়েই এই বই।

বারাব্বাসের বয়স মাত্র তিরিশ, চেহারা শক্তসমর্থ। গায়ের রং ফ্যাকাসে, লালচে দাড়ি, চুল কৃষ্ণবর্ণ। ভ্রূযুগলও কালো। চোখ দুটি গর্তে-বসা; মনে হয় আত্মগোপন করতে চাইছে। চোখের একটু নীচে একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন। দাড়িতে ঢাকা পড়ে যাওয়ায় এখন আর তা দৃষ্টিগোচর হয় না। এ তো গেল তার চেহারার কথা। চেহারার দাম আর কতটুকু।

শাসনকর্তার প্রাসাদের কাছ থেকে শুরু করে সারাটা পথ সে জনতাকে অনুসরণ করে এসেছে; তবে ভিড়ের মধ্যে নিজেকে সে মিশিয়ে দেয়নি। বরং খানিকটা দূরে দূরেই ছিল। ক্রুশবাহী লোকটি হঠাৎ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সে-ও তা দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিল তৎক্ষণাৎ। তা নইলে তারই উপরে হয়ত ক্রুশটিকে চাপিয়ে দেওয়া হতো। বাকিটা পথ সাইমন সেই ক্রুশ বহন করে নিয়ে এসেছে। জনতার মধ্যে খুব বেশী পুরুষকে সে দেখেনি; শুধু ঐ রোমান সৈন্যগুলোকে ছাড়া। বাদবাকি আর সবাই প্রায় স্ত্রীলোক। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত লোকটির সঙ্গে সঙ্গেই তারা আসছিল। হা-ঘরে একদল ছেলেও জুটে গিয়েছিল সেই সঙ্গে। কাউকে যখন ক্রুশবিদ্ধ করতে নিয়ে যাওয়া হয়,

ছেলেগুলোও ঠিক জুটে যায় তখন। খানিকটা আমোদ পায় হয়ত। কিন্তু খুব বেশী দূর তারা আসেনি। একটু বাদেই ক্লান্ত হয়ে খেলতে ফিরে গিয়েছিল। যাবার আগে পিছনের সেই লোকটির দিকে অবাক হয়ে তারা তাকিয়েছিল একবার। সেই লোকটি, যার ঠিক চোখের নীচেই গভীর একটা ক্ষতচিহ্ন। জনতার ঠিক পিছন-পিছনই সারাটা পথ সে অতিক্রম করে এসেছে।

সে এখন এই বধ্যভূমিতে এসে দাঁড়িয়েছে, মাঝখানের ক্রুশটিতে বিদ্ধ লোক-টির দিকে তাকিয়ে আছে। চোখ ফিরিয়ে নেবার শক্তি তার নেই। সত্যি বলতে কি, সে এখানে আসতে চায়নি। জায়গাটাকে সে অশুচি এবং অপবিত্র বলেই মনে করে। কেউ যদি এখানে আসে তো তার আত্মার খানিকটা অংশ এখানে থেকেই যায়। যেমনটি আসে তেমনটি আর ফেরে না। সর্বত্র মড়ার মাথার খুলি, হাড়গোড়, আর ভাঙা ক্রুশের ছড়াছড়ি। ক্রুশগুলোকে কেউ ছোঁয় না; তাই অব্যবহার্য হয়ে পড়ে রয়েছে। সেই বা এসে দাঁড়িয়েছে কেন? ক্রুশবিদ্ধ ঐ লোকটিকে সে চেনে না। চিনবার কোনো দরকারও তার নেই। তাকে তো মুক্তিদান করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও সে এসেছে কেন?

মুমূর্ষু সেই লোকটির দিকে সে তাকিয়ে ছিল। মাথাটা তার সামনের দিকে ঝুলে পড়েছে। মৃত্যু আসন্ন। চেহারা দেখে শক্তিশালী পুরুষ বলে মনে হয় না। শীর্ণ শরীর। হাত দু'খানি কমনীয়। কখনও কোনো পরিশ্রমসাধ্য কাজ বোধ হয় ও করেনি। আশ্চর্য লোক। চিবুকে হালকা একগুচ্ছ দাড়ি; শিশুর মতো নীরোম বক্ষ। লোকটিকে তার ভাল লাগেনি।

প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে ওকে দেখবামাত্রই বারাব্বাসের মনে হয়েছিল, কী-যেন একটা রহস্য এই লোকটিকে এসে আশ্রয় করেছে। রহস্যটা যে ঠিক কি, তা সে বলতে পারে না। অনুভব করতে পারে মাত্র। এমন লোক সে দুটি দেখেনি। হতে পারে, অন্ধকার কারাকক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে দৃষ্টি তার ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। তাই বোধ হয় মনে হয়েছিল, লোকটির চারদিকে যেন আশ্চর্য এক আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। খানিক বাদেই সেই আলোকচক্র মিলিয়ে গেল। বারাব্বাসের দৃষ্টি ততক্ষণে স্বাভাবিক হয়ে এসেছে; চারপাশের অন্যান্য জিনিসকেও সে তখন

দেখতে পাচ্ছে। সে যাই হোক, লোকটি যে খানিকটা রহস্যময়, এ-অনুভূতি তার এখনও কাটেনি। এ-লোক আর-পাঁচজনের মতো নয়। ও-ও বন্দী, ওকেও যে ঠিক বারাব্বাসেরই মতো মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে, তা যেন ভাবাও যায় না। ব্যাপারটার তাৎপর্য সে ঠিক বুঝতে পারেনি। তার অবশ্য কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। তা সত্ত্বেও তার অবাক লাগল, এমন লোককে কেউ মৃত্যুদণ্ড দেয়? লোকটি যে নির্দোষ, বারাব্বাসের তাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই।

লোকটিকে তারপর ক্রুশবিদ্ধ করতে নিয়ে যাওয়া হলো। আর বারাব্বাসের শৃঙ্খল মোচন করে দিয়ে বলা হলো যে, তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। তার এতে কোনো হাত ছিল না। যা ওরা ভাল বুঝেছে, তাই করেছে। দু'জনের মধ্যে কোন্ জনকে ক্রুশবিদ্ধ করা হবে, সে বিষয়ে ওদের ইচ্ছেই চূড়ান্ত। বারাব্বাসের কপাল ভালো, সে তাই ছাড়া পেয়ে গিয়েছে। দু'জনকেই তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। তারপর ঠিক হলো যে, একজনকে ছেড়ে দেওয়া হবে। তাকেই যে ছেড়ে দেওয়া হবে, বারাব্বাস তা ভাবতেও পারেনি। ওরা এসে তার শৃঙ্খলমোচন করে দিল। অন্য লোকটিকে তখন তোরণপথে বার করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। চারদিকে তার শাস্ত্রীদের কড়া পাহারা, পিঠে তার ক্রুশ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শূন্য তোরণপথে স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো তাকিয়ে ছিল বারাব্বাস। প্রহরী এসে তাকে একটা ঠেলা দিয়ে তারপর গর্জন করে উঠল, "হাঁ করে দেখছিস কি! যা, পালা!" সম্বিৎ ফিরে এসেছিল বারাব্বাসের। সেও তারপর ঐ তোরণপথেই বেরিয়ে এসেছিল। অন্য লোকটি তখন ক্রুশ বহন করে অগ্রসর হচ্ছে। বারাব্বাস তার অনুসরণ করতে লাগল। কেন, সে জানে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে কেন-যে সে ওর মৃত্যুযন্ত্রণা দেখছে, তা-ও না। তার এতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই।

ঐ যে যারা ঐ ক্রুশের চারপাশে এসে সমবেত হয়েছে, আসতে তাদের কেউ বাধ্য করেনি। স্বেচ্ছাতেই ওরা এসেছে। কিন্তু এই জায়গাটা ভারী অপবিত্র। না এলেও ওরা পারত। লোকটার ওরা কে? আত্মীয়বান্ধব বোধ হয়। অশুচি এই বধ্যভূমিতে এসেও ওদের এতটুকুমাত্র ক্ষোভ নেই। বারাব্বাসের অবাক লাগল।

উনিই বোধ হয় মা। লোকটার সঙ্গে ওঁর চেহারার কিন্তু কোনো মিল নেই। কিন্তু শুধু মা'র কেন, কারুরই কোনো মিল নেই ওর সঙ্গে। মা'র চেহারা চাষী-মেয়ের মতো। তেমনি কঠিন, তেমনি বিষণ্ণ। সারা মুখ তাঁর অশ্রুপ্লাবিত। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে সারাক্ষণ তিনি সেই অশ্রু মার্জনা করে চলেছেন। কাঁদছেন, তবু নিঃশব্দ। অন্যান্যরাও শোকপ্রকাশ করছে। মা'র শোক অন্যরকম। অন্যান্যরাও ওই লোকটির দিকে তাকিয়ে আছে। মা তাকিয়ে আছেন অন্যভাবে। উনিই যে মা, বারাব্বাসের আর তাতে এতটুকুমাত্র সন্দেহ নেই। মা'র দুঃখই সব থেকে বেশী। কিন্তু চোখে যেন তাঁর একটি ভর্ৎসনাও ফুটে উঠেছে। ছেলেকে তিনি ভর্ৎসনা করছেন হয়তো—সে কেন এই শাস্তি ডেকে নিল? যতোই ভালমানুষের মতো লাগুক, নিশ্চয়ই কিছু একটা করেছে। গুরুতর কোনো অপরাধ। তা নইলে আর প্রাণদণ্ড হবে কেন? মা'র ধারণা, ছেলে তাঁর নির্দোষ। সব মা-ই তাই মনে করেন; ছেলে তাঁদের শত-অপরাধ করুক, সে অপরাধকে তাঁরা অপরাধ বলেই গণ্য করেন না।

বারাব্বাসের মা নেই। বাবাও না। বাপ-মা'র কথা সে শোনেওনি ... নও। আত্মীয়স্বজনও তার নেই। তাকে যদি আজ ক্রুশবিদ্ধ করা হতো তো এম... করে কেউ অশ্রুমোচন করত না। সারাক্ষণ ওরা বুক চাপড়াচ্ছে। এত বড় শোক যেন আর পায়নি কখনও। সারাক্ষণ ওরা কাঁদছে। সে কান্নার বিরাম নেই।

ডানদিকের ক্রুশটিতে যাকে বিদ্ধ করা হয়েছে, বারাব্বাস তাকে চেনে। সে-ও ওকে দেখেছে বোধ হয়। কী ভাবছে ও কে জানে। হয়ত ভাবছে, বারাব্বাস ওর মৃত্যুযন্ত্রণা প্রত্যক্ষ করতে এসেছে। হয়তো ভাবছে, বারাব্বাস এতে খুশীই হয়েছে। না। অতশত ভেবে সে আসেনি। তবে হাঁ, ওকে ক্রুশবিদ্ধ করাতে তার আপত্তিও নেই। শয়তানটার মরাই ভাল। যে কারণে ওকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে, সে-কারণে অবশ্য নয়। সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে।

মাঝখানের লোকটির দিকে সে আর তাকিয়ে নেই; অন্য একজনের দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু বারাব্বাসের বদলে যাকে আজ ক্রুশবিদ্ধ করা হলো, সে ঐ মাঝের লোকটি। তার জন্যেই সে এসেছে এখানে। কী-যেন একটা ক্ষমতা

আছে ওর। আর সেই ক্ষমতাই যেন বারাব্বাসকে এই অপবিত্র বধ্যভূমিতে টেনে নিয়ে এসেছে। ক্ষমতা? কই দেখে তো তা মনে হয় না! বরং মনে হয়, ভারী দুর্বল। পাশাপাশি তিনজনকে ক্রুশবিদ্ধ করে রাখা হয়েছে। তার মধ্যে ওর যন্ত্রণাই সবচাইতে বেশী। আর-দু'জনও কষ্ট পাচ্ছে অবশ্য। তবে ওর মতো অতটা নয়। মাঝখানের ওই দুর্বল লোকটির থেকে তারা ঢের বেশী শক্তিমান। সে তুলনায় ওকে ভারী করুণ দেখাচ্ছে। ঘাড় খাড়া ক'রে রাখবার মতোও আর শক্তি নেই, মাথাটা সামনের দিকে ঝুলে পড়েছে।

অতি কষ্টে একটু মুখ তুলে চাইল। দুর্বল নীরোম বক্ষ। শ্বাস টানতে কষ্ট হচ্ছে। শুকনো ঠোঁটের উপরে জিভটাকে শুধু বুলিয়ে নিল কয়েকবার। তারপর গোঙাতে লাগল। কী যেন বলতে চায়। খুব তেষ্টা পেয়েছে বোধ হয়। গড়ানো ঢালু জমি; তার একটু নীচের দিকে সান্ত্রীরা সব বসে রয়েছে। পাশা খেলছে। লোকগুলো সব মরতে বড় সময় নেয়। যতোক্ষণ বেঁচে আছে, পাহারা দিতে হবে। সান্ত্রীরা তাই বিরক্ত হয়ে উঠেছে। তেষ্টায় লোকটা গোঙাচ্ছে; তারা তবু নির্বিকার। আত্মীয়দের মধ্যেই একজনকে এগিয়ে আসতে হলো শেষপর্যন্ত। অনিচ্ছাসত্ত্বেও একজন তখন উঠে দাঁড়াল। জলের কলসীতে খানিকটা ন্যাকড়া ভিজিয়ে নিল সে, তারপর একটা লাঠির ডগায় ক'রে সেই ভিজে ন্যাকড়ার পুঁটলিটাকে সামনে এগিয়ে দিল। বিস্বাদ নোংরা জল। দেখেই লোকটি মুখ ফিরিয়ে নিল। প্রহরীটি তখন হাসছে। সঙ্গীদের কাছে ফিরে গিয়ে ব্যাপারটা সে খুলে বলল। তারাও সব হাসতে লাগল তখন। শয়তান।

একটা বীভৎস যন্ত্রণায় লোকটা হাঁপাচ্ছে। আত্মীয়বন্ধুরা তার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। নিরুপায় নৈরাশ্যের দৃষ্টি। আর বেশী দেরি নেই। মৃত্যু আসন্ন। যতো তাড়াতাড়ি এখন মৃত্যু আসে, বারাব্বাস ভাবল, ততোই ভাল। তা হলে আর এই যন্ত্রণা ওকে সহ্য করতে হয় না। এবারে ওর মৃত্যু আসুক। মৃত্যু এলে বারাব্বাস আর এক মুহূর্তও এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে না। তৎক্ষণাৎ সে চলে যাবে। এ নিয়ে আর সে চিন্তাও করবে না কোনদিন।...

আর সেই পাহাড়ের উপরে হঠাৎ এক অদ্ভুত অন্ধকার নেমে এল। সূর্য

মুছে গিয়েছে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। আর তারই মধ্যে সেই ক্রুশবিদ্ধ মানুষটির আর্ত কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল:

—ভগবান! তুমি আমায় পরিত্যাগ করলে কেন?

মৃত্যুপথযাত্রীর সেই আর্ত কণ্ঠ যেন বড়ই ভয়ঙ্কর শোনাল। কথাটার মানে কী? আর এই মধ্যাহ্নকালেও চারদিক অতো অন্ধকার হয়ে গেল কেন? বারাব্বাস কোনো কারণ খুঁজে পেল না। পাশাপাশি তিনটি ক্রুশ। অন্ধকারের মধ্যে তারা হারিয়ে গিয়েছে। প্রতিমুহূর্তেই যে একটা বিপদ এগিয়ে আসছে তাতে সন্দেহ নেই। ভয়ঙ্কর কোনো বিপদ। সান্ত্রীরা সব ভয়ে লাফিয়ে উঠল, বজ্রমুষ্টিতে আঁকড়ে ধরল তাদের অস্ত্র। ঐ অস্ত্রই তাদের একমাত্র সম্বল। বর্শা হাতে তারা দাঁড়িয়ে রইল, ফিস্‌ফাস কথা কইতে লাগল নিজেদের মধ্যে। বোঝা গেল ওরা ভয় পেয়েছে। একটু আগের সেই হাসির আর এখন চিহ্নমাত্র নেই। সংস্কারের কাছে ওরা পরাজয় স্বীকার করেছে।

বারাব্বাসও ভয় পেয়েছে। ধীরে ধীরে ফের আলোর চিহ্ন ফুটে উঠতেই সে নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচল। চতুর্দিক আবার স্বাভাবিক হয়ে আসছে। ধীরে ধীরে আলো ফুটে উঠছে। খুব ধীরে ধীরে। যেন ভোর হলো। পাহাড়ের উপরে, অলিভ গাছের পাতায় পাতায় তার ছোঁয়া লাগল। পাখিরা সব স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল; তারা ফের গান গেয়ে উঠল। ঠিক যেন ভোর হয়েছে।

আত্মীয়বন্ধুরা সব স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর কান্না নয়। আর বিলাপ নয়। ক্রুশবিদ্ধ সেই লোকটির দিকে তারা তাকিয়ে আছে। সান্ত্রীরাও। কারুর মুখেই কোনো কথা নেই। সবাই নির্বাক।

বারাব্বাসের এবার ছুটি। যেখানে খুশি সে চলে যেতে পারে। যা হবার হয়ে গিয়েছে। সূর্য উঠেছে। সব কিছুই তাই আগের মতোই স্বাভাবিক। লোকটি মারা গেল। তাই বুঝি সব অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল।

বারাব্বাস এবারে বিদায় নেবে। লোকটি মারা গিয়েছে, তারও আর দাঁড়িয়ে থাকবার দরকার নেই। থাকবার কোনো মানেও হয় না। যাবার আগে সে দেখল, ক্রুশের থেকে তার দেহটিকে ওরা নামিয়ে এনেছে। দুজনে মিলে সেই

মেঝের উপরে শাদা একটুকরো কাপড় বিছিয়ে দিল। তারপর সেই শবদেহটিকে তারা সযত্নে বহন করে নিয়ে চলল। লোকটিকে ওরা আলতো-হাতে ধরে রয়েছে, পাছে আবার ব্যথা লাগে। বারাব্বাসের অবাক লাগল। লোকটি তো মরেই গিয়েছে, তবে আর এই সতর্কতা কেন? এরা সব আশ্চর্য মানুষ। মা'র চোখে আর জল নেই। অশ্রুহীন চোখে তিনি তাঁর ছেলের মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। তাঁর সেই বাদামী-কঠিন মুখে হয়তো না দুঃখ, তার চাইতেও ঢের বেশী দুঃখ তাঁর হৃদয়ে। তিনি যেন হতভম্ব হয়ে গিয়েছেন। কোনো কিছুই আর বুঝে উঠতে পারছেন না। বারাব্বাস তাঁর দুঃখ বুঝল। শোকার্ত সেই মিছিল ততক্ষণে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়েছে। পুরুষরা বহন করে নিয়ে চলেছে সেই মৃতদেহ, মেয়েরা তাদের পিছনে-পিছনে হাঁটছে। একটি মেয়ে যেন কী বলল মা'কে, তারপর আঙুল তুলে বারাব্বাসকে দেখিয়ে দিল। চলতে চলতেই মা ফিরে তাকালেন। একটা নিরুপায় দুঃখ আর খানিকটা ভর্ৎসনা যেন তাঁর দুই চক্ষুর মধ্যে এসে মিলিত হয়েছে। সে দৃষ্টি ভুলবার নয়। মিছিল এগিয়ে চলল। সামনেই গল্‌গথার সড়ক। সেখানে গিয়ে তারা বাঁ দিকে মোড় নিল।

পিছন পিছন এগিয়ে চলল বারাব্বাস। মাঝখানে বেশ খানিকটা ব্যবধান। তাকে তাই কেউ দেখতে পেল না। খানিক এগিয়েই একটি উদ্যান। পাহাড়ের গা কেটে সেখানে একটি গহ্বর রচনা করা হয়েছে। মৃতদেহটিকে সেই গহ্বরের মধ্যে তারা নামিয়ে দিল; তার পাশে দাঁড়িয়ে সবাই প্রার্থনা করল কিছুক্ষণ। তারপর বিরাট একখণ্ড পাথর নিয়ে এসে গহ্বরের মুখ রুদ্ধ করে দিয়ে তারা চলে গেল।

বারাব্বাস তখন সেই সমাধি-ভূমির পাশে গিয়ে দাঁড়াল। নীরবে সে দাঁড়িয়ে রইল, প্রার্থনা জানাল না। সে পাপী; পাপের সে প্রায়শ্চিত্ত করে নি। তার প্রার্থনা তাই কেউ গ্রহণ করবে না। আর তা ছাড়া মৃত লোকটিকে সে চেনেও না। একটা অচেনা লোক, তার জন্যে সে প্রার্থনা জানাতে যাবে কেন? নীরবে সে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ।

তারপর জেরুসালেমের পথে রওনা হয়ে গেল।

গেট অব ডেভিড থেকে খানিকটা পথ এগোতেই একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা হলো বারাব্বাসের ; মেয়েটি তার চেনা। ওপরকার ঠোঁটটি ঈষৎ চেরা তার। রাস্তার ধারের একটা বাড়ির গায়ে ঠেসান দিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমটায় সে এমন একটা নির্লিপ্ত ভাব দেখাল যেন বারাব্বাসকে সে দেখতেই পায়নি। বারাব্বাসের সেটা চোখ এড়াল না। বুঝল যে, এখানে যে তাকে দেখতে পাওয়া যাবে, মেয়েটি তা আশাই করেনি। সে বোধ হয় ভেবেছিল, বারাব্বাসকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সে তার কাছে গিয়ে পৌঁছল। আবার দেখা হলো তাদের। অথচ এর কোনো দরকার ছিল না। তার সঙ্গে ফের কথা বলতে যাবারও কোনো দরকার ছিল না বারাব্বাসের। নিজের আচরণে সে নিজেই অবাক হলো। মেয়েটিও বিস্মিত হয়েছে, মাঝে মাঝে তার দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছে। চাউনিটা লাজুক।

অথচ কী-যে তারা চায়, কেউই তা খুলে বলল না। মেয়েটি এখন কোথায় যাবে, গিলগলের থেকে সে কোনো খবর পেয়েছে কিনা, বারাব্বাস তাকে এইটুকুই শুধু জিজ্ঞেস করল। মেয়েটি সে-কথার জবাব দিল বটে, তবে অত্যন্তই সংক্ষেপে। বারাব্বাস দেখল, উত্তর দিতে গিয়ে তার কথাগুলি একটু জড়িয়ে-জড়িয়ে যাচ্ছে। এইভাবেই ও কথা বলে, বারাব্বাস তা জানে। আপাতত ও কোথাও যাচ্ছে না। আজকাল ও থাকে কোথায়, তাও বারাব্বাস জিজ্ঞেস করেছিল। মেয়েটি তার জবাব দিল না। পোষাক তার শতচ্ছিন্ন; পা দুখানি অনাবৃত, ধূলিধূসর। এর পর আর কথা জমল না। পাশাপাশি তারা নীরবে পথ চলতে লাগল।

রাস্তার ধারেই একটি বাড়ি। দরজা খোলা। ভেতর থেকে একটা হল্লোড়ের শব্দ ভেসে আসছে। বাড়িটাকে তখনও তারা ছাড়িয়ে যায়নি, সুলাজিনী একটি মেয়ে হঠাৎ প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে তার ভিতর থেকে বেরিয়ে

এল। চেঁচিয়ে সে ডাকল বারাব্বাসকে। মেয়েটি মদ খেয়েছে, টলছে। পাগলের মত সে হাত-পা ছুঁড়তে লাগল। বোঝা গেল, বারাব্বাসকে দেখে তার খুব ফুর্তি হয়েছে। ঝামেলা না বাড়িয়ে বারাব্বাস যদি এখন ভিতরে গিয়ে ঢোকে তাহলেই সে খুশী হবে। সঙ্গে একটি মেয়ে রয়েছে; বারাব্বাস তাই একটু ইতস্তত করতে লাগল। মোটা মেয়েটি আর কথা বাড়াল না; দুজনকেই সে জাপটে ধরে ভিতরে নিয়ে গেল। দুটি পুরুষ আর তিনটি মেয়ে এতক্ষণ ভিতরে বসে জটলা করছিল। বারাব্বাসকে দেখে আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠল তারা। জায়গাটা ঈষৎ অন্ধকার। বারাব্বাস তাই প্রথমটায় তাদের দেখতে পায়নি। অন্ধকারটা একটু সয়ে আসতেই ঘরের চেহারাটা তার চোখের সামনে ফুটে উঠল। মাঝখানে একটি টেবিল। তার চারপাশে তারা গোল হয়ে বসে আছে। বারাব্বাসকে তারা আদর করে কাছে টেনে বসাল। একই সঙ্গে সবাই কথা বলতে চায়, কারুর কথাই তাই বুঝতে পারা যায় না। এইটুকু শুধু বোঝা গেল যে, তারা খুব খুশী হয়েছে। বারাব্বাসের সামনে তারা একপাত্র মদ এগিয়ে দিল। তারপর ফের কথা বলতে শুরু করল। বারাব্বাসকে যে মুক্তি দেওয়া হয়েছে এবং তার জায়গায় যে আর-একজনকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে, এইটেই তাদের আনন্দের কারণ। আর সেই আনন্দের তোড়ে তারা উচ্ছল হয়ে উঠল। যে-যার পাত্রে মদ ঢেলে নিল আবার। বন্ধুদের ধারণা হয়েছে, বারাব্বাস খুব ভাগ্যবান পুরুষ, তাকে স্পর্শ করলে তাদেরও নির্ঘাৎ কপাল খুলে যাবে। একটি মেয়ের আর তর সইল না। বারাব্বাসের জামার তলা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে সে তার রোমশ বক্ষ স্পর্শ করল। মোটা মেয়েটি তার পাশেই দাঁড়িয়েছিল। খলখলে হেসে উঠল সে।

চুপচাপ মদ্যপান করল বারাব্বাস। বিশেষ কোনো কথা বলল না। অদ্ভুত একটা শূন্যতা এসে তাকে আশ্রয় করেছে। সামনের দিকে তার দৃষ্টি প্রসারিত। মুখে কোনো কথা নেই। চোখ দুটি গাঢ়-বাদামী, গর্তে-বসা। দেখে মনে হয়, আত্মগোপন করতে চাইছে। স্তব্ধ হয়ে সে বসে রইল। সবাই একটু অবাক হলো তাতে। তবে হ্যাঁ, মাঝে মাঝেই তার এরকম ভাবান্তর হয়। বন্ধুরা তা জানে।

পানপাত্র নিঃশেষ হতেই মেয়েরা সেটি ফের পূর্ণ করে দিল। চুপচাপ সে মদ খেয়ে যেতে লাগল। মুখে কোনো কথা নেই।

বন্ধুরা আর স্থির থাকতে পারল না। কী হয়েছে তার? অমন গুম হয়ে বসে আছে কেন? বারাব্বাসের উপরে তাদের প্রশ্নবাণ বর্ষিত হতে লাগল। স্থুলাঙ্গিনী সেই মেয়েটি এসে নিরস্ত করল তাদের। দুহাতে সে বারাব্বাসের কণ্ঠ বেষ্টন করে দাঁড়াল। তারপর বন্ধু-বান্ধবদের দিকে তাকিয়ে বলল যে, বারাব্বাসের এই নিস্তব্ধতায় তাদের অবাক্ হবার কোনো কারণ নেই। দীর্ঘদিন সে বন্দী হয়ে ছিল, প্রায় মারা গিয়েছিল বললেই চলে। প্রাণদণ্ডে যাকে একবার দণ্ডিত করা হয়, মৃত্যুকে সে অবধারিত বলেই জানে। তারপর তাকে মুক্তিও দেওয়া হয় তো তা-সত্ত্বেও সে আর স্বাভাবিক মানুষ হয়ে উঠতে পারে না। বারাব্বাসকেও মৃত্যুদণ্ডই দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং সে মারা গিয়েছিল বললেই চলে। সে আর সেই স্বাভাবিক মানুষ নেই। তার এই কথায় সবাই হেসে উঠল। মেয়েটি তখন আর রাগ সামলাতে পারল না; সাফ জানিয়ে দিল ফের যদি তারা ওরকম হাসে তো একমাত্র বারাব্বাস আর তার সঙ্গের মেয়েটি ছাড়া বাদবাকী সবাইকে সে বাড়ি থেকে বার করে দেবে। এই নতুন মেয়েটিকে সে চেনে না, তা সত্ত্বেও তাকে তার ভালোই লেগেছে। মেয়েটি একটু বোকা বোকা অবশ্য; কিন্তু তা হোক। লোক দুটি একটু চুপ করেছিল। এব [illegible] তারা ফের হো-হো করে হেসে উঠল। হাসির তোড়টা একটু থিতিয়ে আ[illegible] পর ফিসফাস কথা শুরু হলো আবার। বারাব্বাসকে তারা জানিয়ে দিল যে, আজ রাত্রেই তারা ফের পাহাড়ে ফিরে যাচ্ছে। অন্ধকারটা একটু ঘনিয়ে আসবার পরেই তারা রওনা হবে। এখানে তারা একটি ভেড়া বলি দিতে এসেছিল। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে, ভেড়াটির একটু খুঁত রয়েছে। সেটিকে তাই বিক্রি করে দিয়ে তার জায়গায় তারা দুটি পায়রা বলি দিয়ে এসেছে। পকেটে তাদের আরও কিছু পয়সা ছিল, তাই একটু ফুর্তি করতে এসেছে এখানে। বারাব্বাসকে তারা তাদের নতুন আস্তানার ঠিকানা দিয়ে দিল। তারপর বলল, সে যেন সেখানে যায়। জায়গাটা সে চিনতে পেরেছে তো? যাবে তো সেখানে?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে মাথা নাড়ল বারাব্বাস; দ্বিতীয় প্রশ্নের সে জবাব দিল না।

বারাব্বাসের জায়গায় যাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে, আর-একটি মেয়ে ইতিমধ্যে তার সম্পর্কে কী-যেন কথা বলতে শুরু করেছিল। পথ-চলতি মেয়েটি তাকে একদিন দেখেছে। সবাই বলাবলি করছিল, লোকটা নাকি অনেক ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেছে, সে নাকি খুব ভবিষ্যদ্বাণী করে বেড়ায়। আরও নাকি কী-সব অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড করে। তা সে তো অনেকেই করে, তাতে আর ক্ষতি কি। লোকটা নিশ্চয়ই অন্য কিছু একটা গুরুতর অপরাধ করেছে। তা নইলে আর, আর যাই হোক, ক্রুশবিদ্ধ করা হতো না। লোকটার চেহারাও তার মনে আছে। নিতান্তই অস্থিচর্মসার। আর-একটি মেয়ে বলল লোকটাকে সে দেখেনি বটে, তবে তার সম্পর্কে অনেক গল্প শুনেছে। সে নাকি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে, এখানকার মন্দির একদিন ধ্বসে পড়বে। আর একটা বিরাট ভূমিকম্পে এই জেরুসালেম নাকি একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, খুব বড় রকমের একটা অগ্নিকাণ্ড হবে তারপর; স্বর্গ আর পৃথিবী, দুই-ই তাতে ভস্ম হয়ে যাবে। বদ্ধ পাগল! এই পাগলামির জন্যেই লোকটাকে বোধ হয় ক্রুশবিদ্ধ করা হলো। আর-একটি মেয়ে তখন বলল যে, লোকটা নাকি গরীব দুঃখীদের সঙ্গে খুব মেলামেশা করত। আর তাদের প্রায়ই নাকি বলত যে, মৃত্যুর পর তারা স্বর্গে যাবে। শুধু গরীবরাই নয়, বেশ্যারাও নাকি সব স্বর্গলাভ করবে। লোকটা অন্তত তাই বলেছিল। কথা শোনো একবার! হাসতে হাসতে সবাই গড়াগড়ি খেতে লাগল। তারাও স্বর্গলাভ করবে! লোকটা বলে কী!

বারাব্বাস এতক্ষণ একমনে তাদের কথা শুনে যাচ্ছিল। তার সেই ভাবান্তর এখন একটু কেটে এসেছে। মুখে তবু হাসি নেই। হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াতেই মোটা মেয়েটি তার গলা জড়িয়ে ধরল। জোর করে ফের বসিয়ে দিল তাকে। তারপর বলল, ক্রুশবিদ্ধ লোকটি যে কে, তা নিয়ে তার কিছুমাত্র মাথাব্যথা নেই। সে-ই হোক, মরে সে এতক্ষণে কাঠ হয়ে গিয়েছে। তার বদলে বারাব্বাস যে মুক্তিলাভ করেছে, এইতেই সে সুখী।

বারাব্বাসের সঙ্গিনী সেই ঠোঁটকাটা মেয়েটি এতক্ষণ জবুথবু হয়ে বসেছিল। আলাপ-আলোচনায় তার তেমন উৎসাহ দেখা যায়নি। আসলে কিন্তু সারাক্ষণ সে একটা চাপা-উত্তেজনা নিয়ে সেই মৃত লোকটির বর্ণনা শুনে গিয়েছে। হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াল; বিবর্ণ রক্তশূন্য মুখে তাকিয়ে রইল তার সঙ্গীর দিকে। সারা মুখ তার ভয়ে শাদা হয়ে গিয়েছে। চাপা ফ্যাসফেসে গলায় সে চিৎকার করে উঠল:

—বারাব্বাস! তুমি বারাব্বাস!

তেমন কিছু আশ্চর্য ব্যাপার নয়, বারাব্বাসকে সে তার নাম ধরে সম্বোধন করেছে মাত্র। কিন্তু অমন চেঁচিয়ে উঠল কেন? ব্যাপারটা কারুর বোধগম্য হলো না। তবে সবাই বুঝল যে, বারাব্বাসও এতে খানিকটা অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করেছে। দৃষ্টি তার অস্থির হয়ে উঠেছে। যেন এখন পালাতে পারলেই বাঁচে। সবাই একটু বিস্ময়বোধ করল। কিছু একটা ঘটেছে নিশ্চয়ই। কিন্তু যা-ই ঘটুক, তাদের তাতে কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। সুতরাং তা নিয়ে এখন মাথা ঘামাতে যাওয়াও অর্থহীন। আর তা ছাড়া, বন্ধু হিসেবে বারাব্বাস যতোই চমৎকার হোক, একটু যে খামখেয়ালী তাতে সন্দেহ নেই। সব সময় তাই ওকে ঠিক বুঝে উঠতে পারা যায় না।

মেয়েটি ততক্ষণে আবার জড়সড় হয়ে বসে পড়েছে। তবে দৃষ্টি তার বারাব্বাসের উপরেই নিবদ্ধ। চোখ দুটিতে যেন আগুন জ্বলছে।

মোটা মেয়েটি এক সময়ে উঠে গিয়ে বারাব্বাসের জন্যে কিছু খাবার নিয়ে এল। আহা বেচারা! অনাহারে রয়েছে নিশ্চয়ই। কয়েদে কি আর ওকে খেতে দিয়েছে কিছু। শয়তানরা ওকে না-খাইয়েই রেখেছে। বারাব্বাসের সামনে সে তার খাবারের পাত্রটাকে এগিয়ে দিল। সামান্য কিছু রুটি, নুন, আর একটুকরো শুকনো মাংস। বারাব্বাস তা ছুঁলো কি ছুঁলো না। অল্প কিছু মুখে দিয়ে বাকিটা সে তার সঙ্গিনীর দিকে এগিয়ে দিল। আর মেয়েটিও যেন ক্ষুধার্ত পশুর মত ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই খাবারের উপর। গোগ্রাসে তাকে গলাধঃকরণ করল। তারপর ঘরের থেকে সে প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল।

বন্ধুরা সব স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছে। কে এই মেয়েটা, কে? বারাব্বাস কোনো জবাব দিল না। নিজের ব্যাপারেও বরাবরই একটু চাপা। বন্ধুরা তা জানে। তারা তাই চুপ করে রইল।

বারাব্বাসই কথা কইল সর্বপ্রথম। মেয়েদের দিকে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করল:

—লোকটা সব অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড করত বলছিলে না? কী রকম অদ্ভুত কাণ্ড? আর সে প্রচারটাই বা করত কী?

মেয়েরা বলল, লোকটা নাকি অসুস্থ লোকদের সারিয়ে তুলত। ভূতপ্রেত তাড়িয়ে দেবার মতও নাকি ক্ষমতা ছিল তার। শোনা যায়, মরা মানুষকেও সে বাঁচিয়ে তুলেছে। তবে হ্যাঁ, কথাটা যে কদ্দূর সত্যি, তা তারা জানে না। খুব সম্ভব সত্যি নয়। কী-যে সে প্রচার করত, সে সম্পর্কেও তাদের কোনো ধারণা নেই। একজন অবশ্য এ-সম্বন্ধে একটা গল্প শুনেছে। আর এই গল্পটাও নাকি ঐ-লোকটাই চারদিকে ছড়িয়ে বেড়িয়েছিল। বিয়ে না কি-একটা উপলক্ষে একজন একবার বিরাট এক ভোজসভার আয়োজন করে। কিন্তু কেউই নাকি তার বাড়িতে ভোজ খেতে আসেনি। এত খাবার নষ্ট হয়ে যাবে? লোকটা আর উপায় না দেখে রাস্তার থেকে সব গরীব-দুঃখীদের জুটিয়ে আনল। ভগবান তাতে খুব চটে গিয়েছিলেন। না কি তিনি খুব খুশী হয়েছিলেন বোধ হয়। মোট কথা, কী যে ঠিক হয়েছিল, তা আর এখন তার মনে নেই।

চুপচাপ বারাব্বাস সব শুনে যাচ্ছিল। ব্যাপারটা তার কাছে খুব অদ্ভুত মনে হয়েছে। তারপর একটি মেয়ে যখন বলল যে, লোকটা নিজেকে এই পৃথিবীর ত্রাণকর্তা বলে মনে করত, তখন আর তার বিস্ময়ের সীমা রইল না। চুপচাপ বসে বসে সে তার দাড়ির মধ্য দিয়ে আঙুল চালাতে লাগল; মনে হলো যেন এক গভীর সমস্যার মধ্যে সে ডুবে গিয়েছে। অস্ফুট কণ্ঠে আপনমনেই সে বলল:

—ত্রাণকর্তা! না, না, নিশ্চয়ই তা নয়…

তার এক বন্ধুও এ-কথায় সায় দিয়ে বলল যে, ত্রাণকর্তা হলে আর ওকে ক্রুশবিদ্ধ করতে হত না; শাস্ত্রীরাই সব মারা পড়ত। ত্রাণকর্তা যে কাকে বলে, তা সে খুব ভা[illegible]

—ঠিক। সেক্ষেত্রে সে ক্রুশের থেকে নেমে এসে সবাইকে হত্যা করত।

—যা বলেছ। ত্রাণকর্তাকে কি আর ক্রুশে বিঁধিয়ে মারা যায়? যতো সব বাজে কথা।

চিবুকে হাত রেখে চুপ করে বসে রইল বারাব্বাস। দৃষ্টি তার মাটির উপরে নিবদ্ধ।

—না, ত্রাণকর্তা নয়; অসম্ভব।

—নাও হে বারাব্বাস, বিড়বিড় না করে এখন একপাত্র খেয়ে নাও দেখি। বলেই তার এক বন্ধু তার পাঁজরে একটা খোঁচা মারল। এটা তার রসিকতা সন্দেহ নেই, তবে বারাব্বাস তা গায়ে মাখল না। পাশেই মদের ভাঁড়। সেটাকে নিঃশেষ করে সে ফের মাটিতে নামিয়ে রাখল। মেয়েরা সেটাকে ভরে দিল আবার। আবারও তা নিঃশেষ হলো। নেশা ধরে গিয়েছে বারাব্বাসের, তবে তার ভাবান্তরটা এখনো কাটেনি। লোকটা তাকে আর-একটা খোঁচা দিয়ে বলল:

—ওসব ভাবনা-চিন্তা এখন রাখো, মদ খেয়ে একটু চাঙ্গা হয়ে নাও দেখি। আরে বাপু, কোথায় এতক্ষণ ক্রুশের উপরে ঝুলে মরতে, তার বদলে দিব্যি এখানে বসে ইয়ারদোস্তদের সঙ্গে ফুর্তি করছ। এইটেই কি ভাল নয়? নাকি এতেও তোমার শান্তি নেই? বন্ধু হে, বড় বাঁচা বেঁচে গিয়েছ; সেইটিই হচ্ছে আসল কথা।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়, বারাব্বাস বলল, তাতে আর সন্দেহ কি।

দুই চক্ষুর মধ্যে তার যে উদ্‌ভ্রান্ত ভাবটি ছড়িয়ে গিয়েছিল, ধীরে ধীরে তা মুছে আসতে লাগল। আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠল সে; মদ্যপানের ফাঁকে ফাঁকে এটা-ওটা কথা কইতে লাগল। বন্ধুরাও একটু নিশ্চিন্ত হলো তাতে। কিন্তু সেই কথাবার্তার মধ্যেই বারাব্বাস তার বন্ধুদের হঠাৎ অদ্ভুত একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে বসল। সূর্যের সমস্ত আলো যে আজ নিভে গিয়েছিল, বারাব্বাস শুধোল, তা নিশ্চয়ই তারা লক্ষ্য করেছে? হঠাৎ অমন অন্ধকার হয়ে গেল কেন?

—অন্ধকার? কিসের অন্ধকার? বন্ধুরা সব অবাক হয়ে বলল, কই, কোথাও ত অন্ধকার হয়নি? না-কি হয়েছিল? কখন?

—সেকি, দুপুর বেলা সব যে অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। তোমরা তা লক্ষ্য করনি?

যত্তো সব বাজে কথা। হো হো করে সবাই হেসে উঠল। বিস্মিত হয়ে গেল বারাব্বাস; এর ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল। বন্ধুরা তাকে স্পষ্ট জানাল যে কোথাও তারা অন্ধকার দেখতে পায় নি। আর শুধু তারা বলেই নয়, জেরুসালেমের প্রতিটি লোককে বারাব্বাস জিজ্ঞেস করে দেখুক, সবাই সেই একই উত্তর দেবে। তার কি সত্যিই মনে হয়েছিল যে চারদিক অন্ধকার হয়ে গিয়েছে? ভর-দুপুরেই? কী আশ্চর্য! তবে হ্যাঁ, একটা কথা। দীর্ঘদিন সে অন্ধকূপে বন্দী হয়ে ছিল, তাই বোধ হয় অমন অন্ধকার দেখে থাকবে। তা ছাড়া আর এর অন্য কোনো কারণ নেই। মোটা মেয়েটিও তাদের কথায় সায় দিয়ে বলল যে, কারাগারের থেকে আচমকা বাইরে বেরিয়ে এসেছে কিনা, সূর্যের আলোতে তাই তার চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। সেইটেই স্বাভাবিক। বারাব্বাস তাদের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। চোখে তার একটা সংশয় ফুটে উঠেছে। সংশয়টা ধীরে ধীরে নিভে এল। মনে হলো সে একটু আশ্বস্ত হয়েছে। এতক্ষণে সে একটু সোজা হয়ে বসতে পারল। হাত বাড়িয়ে সে তার পাত্রটিকে কাছে টেনে নিয়ে মুহূর্তে সেটিকে নিঃশেষ করল। তারপর সামনে এগিয়ে ধরল। সে এখন আরও মদ চায়; আরও। সকলেই পানোন্মত্ত। বারাব্বাসও। এতক্ষণে তার একটু নেশা জমে উঠেছে। এ-নেশাটা যেন অন্য রকমের। আগে যেমন মদ্যপান করত, এখনও করছে। তার সেই বিষণ্ণ ভাবটিও আর নেই। খুব বেশী কথা বলছে না অবশ্য। তবে বলতে চাইছে। কারারুদ্ধ অবস্থায় কী-দুঃখে তার দিন কাটত, তাই নিয়েই দু-একটা গল্প করছে। ওঃ, সে ভারী দুঃখের দিন। যন্ত্রণায় তার মাথা খারাপ হয়ে যাবার দাখিল হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত যে সে বেঁচে গেল, এইটেই একটা অবাক কাণ্ড। একবার ধরা পড়বার পর কি আর কাউকে ওরা ছেড়ে দেয়? নেহাৎ কিনা তার কপাল ভাল, তাই সে ছাড়া পেয়ে গিয়েছে। যে লোকটাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে, তার জায়গায় অবশ্য একজনকে ছেড়ে দেবার কথা। কিন্তু সে-একজন যে বারাব্বাসই হবে তা কি সে স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিল? ভাগ্যই তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। ভাগ্য। তাতে আর তার সন্দেহ নেই। আর তাই বন্ধুরা যখন আনন্দে তার পিঠ চাপড়াতে লাগল, হল্লোড় করতে লাগল

তার চতুর্দিকে, তার আর তখন বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা রইল না। সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ল তার, পাত্রের পর পাত্র সে নিঃশেষ করে চলল। যত নেশা, ততই আনন্দ। যত আনন্দ, ততই উন্মাদনা। গরম পড়েছে। গাত্রাবাস খুলে ফেলে সে তাই মাটির উপরে গড়াগড়ি খেতে লাগল। আনন্দে সে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। পাশের মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে সে কাছে টেনে নিল। মেয়েটি হেসে উঠল; বারাব্বাসের কণ্ঠালিঙ্গন করল সে। মোটা মেয়েটি তাকে সরিয়ে দিল। তারপর বলল যে, হ্যাঁ, এতক্ষণে বারাব্বাস ধাতস্থ হয়েছে; সুস্থ হয়ে উঠেছে। দীর্ঘদিন বন্দী-জীবন যাপনের জন্যে মন তার অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। এতক্ষণে তার অবসাদ কাটল। বারাব্বাসের সারা মুখ সে চুমুতে ভরে দিল; আদর করে তার ঘাড়ের উপরে মৃদুমন্দ কয়েকটি টোকা মেরে তারপর তার লালচে দাড়ি নিয়ে খেলা করতে লাগল। এতক্ষণে বারাব্বাস স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। সবাই তাতে সুখী। যেটুকু বা সংকোচ ছিল এতক্ষণ, তাও আর রইল না। মদ খেয়ে তারা প্রগল্‌ভ হয়ে উঠেছে; সর্বশরীরে নেশা আর আনন্দের একটা তীক্ষ্ণ আগুন জ্বালিয়ে নিয়ে তারা অস্থির হয়ে উঠল। মাসের পর মাস তারা মদ খায় নি, স্ত্রীলোকের সান্নিধ্যে আসে নি। লোকসানটাকে তাই এখন বেশ চড়া হারেই পুষিয়ে নিচ্ছে। আর বেশী সময় নেই, একটু বাদেই তারা পাহাড়ে ফিরে যাবে। জেরুসালেমে আসার আনন্দটাকে তাই তারা পূর্ণ করে নিতে চায়। শুধু তাই নয়, তার উপরে আবার বারাব্বাস ছাড়া পেয়েছে; আনন্দটা আজ পুরোমাত্রায় হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ঝাঁঝালো কড়া মদে তাদের শিরায় শিরায় আগুন জ্বলে উঠেছে। মোটা মেয়েটি বাদে বাদবাকী আর সবকটি মেয়েকেই তারা একের পর এক ভিতরের দিককার একটি পর্দার আড়ালে টেনে নিয়ে গেল। খানিক বাদে যখন ফিরে এল, তখন তাদের জোরে-জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে; মুখ রক্তবর্ণ। যে-যার মদের পাত্র নিয়ে ফের কলরবে মত্ত হয়ে উঠল। আনন্দটাকে তারা পুরোমাত্রায় সম্ভোগ করতে চেয়েছিল; তা-ই করেছে।

উৎসব যখন সাঙ্গ হলো, চারদিকে অন্ধকার নেমে এসেছে। লোক দুটি উঠে দাঁড়াল। এবারে তারা বিদায় নেবে। পশুচর্মের গাত্রাবাসে সর্বাঙ্গ আবৃত করে

নিয়ে সবাইকে তারা তাদের বিদায়সম্ভাষণ জানাল। তারপর বেরিয়ে গেল। রাস্তা তখন প্রায় অন্ধকার। মেয়ে তিনটিও একটু বাদেই পর্দার পিছনে গিয়ে শুয়ে পড়ল। নেশায় তারা টলছে, সর্বাঙ্গ অবশ। অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা ঘুমিয়ে পড়ল। এ-ঘরে তখন আর অন্য কেউ নেই। শুধু সেই সুহাসিনী মেয়েটি, আর বারাব্বাস। মেয়েটি বলল, তাদেরও এবারে একটু আনন্দ করা উচিত। বারাব্বাসের উপর দিয়ে যন্ত্রণায় যে ঝড়-ঝাপ্টা গিয়েছে, তাতে তার এখন একটু আনন্দেরই প্রয়োজন। শুধু কি কারাবাসের যন্ত্রণা? আর একটু হলেই তার মৃত্যু ঘটত। তার এখন তাই আনন্দ করাই দরকার। মেয়েটি তাকে ছাদের উপরে নিয়ে গেল। তালপাতার ছাউনি দিয়ে সেখানে ছোট্ট একটি ঘর তৈরি করা হয়েছে। এটি তার নিদাঘ-নিবাস। সেখানে গিয়ে শুয়ে পড়ল তারা। মেয়েটি একটু আদর করল বারাব্বাসকে। বারাব্বাস তাতে উন্মত্ত হয়ে উঠল। এত আনন্দ, এ-যেন সে ছেড়ে যেতে চায়নি। চতুর্দিকের কোনো কিছুর সম্পর্কেই তাদের আর তখন এতটুকু মাত্র চেতনা নেই। অর্ধেক রাত এইভাবেই কাটল।

মেয়েটি তারপর ঘুমিয়ে পড়ল একসময়। বারাব্বাস শুধু জেগে রইল। চোখে তার ঘুম নেই, দৃষ্টি তার আকাশের দিকে নিবদ্ধ। এতক্ষণে তার আবার মনে পড়ল সব। বধ্যভূমিতে আজ যা-কিছু ঘটেছে সবই তার মনে পড়ল। মনে পড়ল সেই মানুষটিকে, ক্রুশবিদ্ধ হয়ে যে আজ প্রাণ দিয়েছে। আর সেই অন্ধকার। সত্যিই কি আজ অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল? তার কোনো ভুল হয়নি তো? নাকি শুধু গলগথায় অন্ধকার নেমেছিল? তাই হবে বোধহয়। এখানে তাই ওরা কিছুই টের পায় নি। যাত্রীরা যে তখন ভয়ে চমকে উঠেছিল, বারাব্বাসের তা স্পষ্ট মনে আছে। না-কি তাও ভুল? সবই কি সে ভুল দেখল? আশ্চর্য! আবার তার সেই লোকটির কথা মনে পড়ল। ক্রুশবিদ্ধ সেই লোকটি। বারাব্বাসের ঘুম এল না। চুপ করে সে শুয়ে রইল। মাথার উপরে তালপাতার ছাউনি; তার মধ্য দিয়ে আকাশ দেখা যায়। তারাহীন অন্ধকার আকাশ। নীরন্ধ্র অন্ধকার।

শুধু গলগথায় নয়, চতুর্দিকেই এখন অন্ধকার নেমে এসেছে।

পরের দিন শহর-ঘুরতে বার হয়ে শত্রুমিত্র অনেকের সঙ্গেই দেখা হলো বারাব্বাসের। প্রায় সকলেই তাকে দেখে বিস্মিত হলো। দু'একজন তো এমন ভাব দেখাল যেন তারা ভূত দেখেছে। বারাব্বাসের সেটা মোটেই ভালো লাগল না। এরা কি জানে না যে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে? তার জায়গায় যে আর-একজনকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে, তা এরা বুঝবে কখন?

প্রখর রৌদ্রে চারদিক ঝলমল করছে। চোখে তার আলো সয় না; বারাব্বাসের তাই অস্বস্তি লাগতে লাগল। এতদিন সে এক অন্ধকূপে বন্দী হয়ে ছিল, চোখ দুটি তাই হয়তো নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকবে। নয়তো আলো সয়না কেন? ছায়ায় ছায়ায় সে হাঁটতে লাগল। রাস্তাটা মন্দিরের দিকে চলে গিয়েছে। একটু এগিয়েই সারি সারি কয়েকটি স্তম্ভ। সেগুলিকে ছাড়িয়ে গিয়ে সে একটি তোরণের তলায় গিয়ে বসল। জায়গাটা ছায়াবৃত। মনে হলো, তার চোখের সেই যন্ত্রণার যেন এতক্ষণে একটু উপশম হয়েছে।

বারাব্বাস দেখল অপরিচিত কয়েকজন লোক তার আগেই সেখানে এসে বসে আছে। নিজেদের মধ্যে কী-যেন তারা বলাবলি করছে। স্পষ্টই বোঝা গেল, তাকে দেখে তারা খুশী হয়নি। এমনিতেই তারা নিচুগলায় কথা কইছিল, স্বরটাকে এবারে আরো নিচুতে নামিয়ে আনল। মাঝে মাঝে চোরা-চাউনি হানতে লাগল তার দিকে। মাথামুণ্ডু কী-যে ওরা বলাবলি করছে, কিছুই বোধগম্য হলো না তার। ছাড়া-ছাড়া এক-আধটা কথা শুধু শুনতে পাওয়া যায় মাঝে মাঝে। বোধ হয় কোনো শলা পরামর্শ করছে। করুক। বারাব্বাসের তাতে ক্ষাতবৃদ্ধি নেই। লোকগুলোর মধ্যে একজন তার সমবয়সী হবে। তারও মুখে লালচে দাড়ি। চুল পর্যন্ত লালচে। চুলগুলি বেশ দীর্ঘ, আর কোঁকড়ানো; দাড়ির সঙ্গে এসে মিশে গিয়েছে। মুখখানা ভরাট, আর বেশ গোলগাল। সব মিলিয়ে একটু আহিরে গোছের চেহারা। হাত দুটি রুক্ষ, বেশভূষা অপরিচ্ছন্ন। কারিগর বোধ হয়।

মোটকথা, যে-ই হোক, আর যা-ই হোক, বারাব্বাসের তাতে লাভ কি? কিছুমাত্র লাভ নেই। তা সত্ত্বেও সে তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে। চেহারায় তাঁর কোনও বৈশিষ্ট্য নেই; তবু। তবে হ্যাঁ, বারাব্বাস ভাবল, চোখ দুটি ভারী নীল।

লোকটি যেন কেমন মুহ্যমান হয়ে পড়েছেন; দেখেশুনে অন্তত তা-ই মনে হয়। আর সবারও সেই একই অবস্থা। পরিচিত কেউ বোধ হয় মারা গিয়ে থাকবে; তাই নিয়েই বোধ হয় কথাবার্তা কইছে। মাঝে মাঝে দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ছে। বারাব্বাস তাতে বিস্মিত হলো। ছী-ছি, পুরুষ হয়েও এরা এত দুর্বল? সে জানত মেয়েরাই শুধু কাঁদে। পুরুষরাও যে কাঁদতে পারে তা তার জানা ছিল না। এতদিনে জানল।

তখনও ওরা কথা কয়ে চলেছে। যাকে নিয়ে তাদের এই আলোচনা, মাত্র কালই নাকি তাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে। কালই··?

কে সে? কে? উৎকর্ণ হয়ে উঠল বারাব্বাস, আর কিছু যদি শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু না, ততক্ষণে ওরা ফের গলা নামিয়ে নিয়েছে।

চারদিকে লোকজনের ভিড়। চিৎকার, হট্টগোল। সব কথা তাই তার কানে গেল না। কিন্তু যেটুকু গেল তাতেই সে পরিষ্কার বুঝতে পারল যে, সেই লোকটির সম্পর্কেই ওরা কথা কইছে। সেই লোকটি, বারাব্বাসের বদলে যে কাল··

কী আশ্চর্য! একটু আগে সে নিজেও যে ঠিক এই চিন্তাই করছিল। এই সেই জায়গা, এইখানেই সর্বপ্রথম সে তাকে দেখতে পায়। আর ঐ যে জায়গাটি, লোকটা ওখানে ক্রুশের ভারে নুয়ে পড়েছিল। তাও তার মনে আছে। মনে আছে। আর তাই ঘুরেফিরে সেই একটি লোকের কথাই সে চিন্তা করে চলেছে। কিন্তু ওরাও কি সেই একই লোকের কথা বলাবলি করছিল এতক্ষণ? কী আশ্চর্য! তার সঙ্গে ওদের সম্পর্ক কি? আর ওরা অতো ফিসফিস করেই বা কথা বলছে কেন? লোহিতশ্মশ্রু ওই ভারিক্কে লোকটির কথাই শুধু মাঝে মাঝে শুনতে পাওয়া যায়, বাদবাকী কারুর কথাই না।

ওরা কি···ওরা কি সেই অন্ধকারের সম্পর্কেও কিছু বলছে? কাল সেই

লোকটা যখন মারা গেল, চারদিক তখন অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। তা নিয়েও কি ওরা আলোচনা করছে ?

উৎকণ্ঠায় অস্থির হয়ে উঠল বারাব্বাস। তার এই অস্থিরতা তাদের চোখ এড়াল না। তৎক্ষণাৎ তারা স্তব্ধ হয়ে গেল। বহুক্ষণ আর কোনো কথা নেই। বারাব্বাস বেশ স্পষ্টই বুঝতে পারল যে, চোরা চাউনি হেনে তারা তাকে লক্ষ্য করে যাচ্ছে। তারপর কী-যেন বলাবলি করল তারা, বারাব্বাস তার বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারল না। খানিক বাদে ভারিক্কে লোকটির কাছ থেকে তারা বিদায় নিয়ে চলে গেল। সবশুদ্ধ তারা চারজন। চারজনের একজনকেও বারাব্বাসের ভাল লাগল না।

এবারে আর অন্য কেউই নেই। তারা দুজন শুধু বসে আছে। সে আর ভারিক্কে সেই লোকটি। বারাব্বাসের ইচ্ছে, তাঁর সঙ্গে কথা কয়। কিন্তু কীভাবে যে আলাপ শুরু করবে, সেইটেই সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। লোকটিকে দেখে চিন্তাগ্রস্ত মনে হয়। আপন মনেই তিনি ঠোঁট কামড়াচ্ছেন, মাথা না[illegible]ছেন। খুব সরল লোক নিশ্চয়ই। মনের ভাব তাই গোপন রাখতে পারছে[illegible]। বারাব্বাস আর থাকতে পারল না; সরাসরি তাঁকে তাঁর দুশ্চিন্তার কারণ [illegible] বলল। প্রশ্ন শুনে তিনি বারাব্বাসের দিকে তাকালেন। চোখ দুটি নীল[illegible] মনে হলো, একটু বিস্মিতও বা। খানিকক্ষণ তিনি তাকিয়েই রইলেন। তা[illegible] জবাব না দিয়ে পালটা প্রশ্ন করলেন বারাব্বাসকে :

—তুমি কি জেরুসালেমেই থাকো ?

—না, এখানে নয়।

—কিন্তু তোমার কথা শুনে তো তা-ই মনে হয় ?

বারাব্বাস তখন বলল যে, তার বাড়ি এখান থেকে খুব দূরে নয়, কথাবার্তায় তাই হয়তো জেরুসালেমের টান এসে গিয়ে থাকবে। সে থাকে পূবদিকের ঐ পাহাড়ে।

শুনে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। জেরুসালেমের লোকদের তিনি বিশ্বাস করেন না। বিন্দুমাত্রও না। এরা সব ডাকাত; শয়তানিতে এদের জুড়ি নেই। বারাব্বাস তা শুনে একগাল হাসল। বলল যে, তারও সেই একই কথা।

—কিন্তু আপনি কোথাকার লোক তা-তো বললেন না ?

—আমি ? আমার বাড়ি অনেক দূরে।

বলতে বলতে তাঁর নীলাভ চোখ দুটি ফের উদাস হয়ে উঠল। বারাব্বাসকে তিনি জানালেন যে, নিজের গ্রাম ছেড়ে তাঁর এখানে আসবার কিছুমাত্রও ইচ্ছে ছিল না। শুধু এই জেরুসালেমেই নয়, কোনোখানেই তিনি যেতে চাননি। তা সত্ত্বেও তাঁকে গৃহত্যাগ করে বেরিয়ে আসতে হয়েছে। কী করবেন তিনি, তাঁর এতে কোনো হাত ছিল না। বলে তিনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করলেন। আর কি কখনও তাঁর বাড়ি ফেরা হবে ? বড় ইচ্ছে ছিল, জন্মভূমিতে ফিরে গিয়ে তিনি তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবেন। তা কি আর তাঁর ভাগ্যে ঘটবে ?

বারাব্বাসের বড় আশ্চর্য লাগল। প্রশ্ন করল :

—কেন, আপনার বাধা কোথায় ? ইচ্ছে করলেই তো আপনি বাড়ি ফিরতে পারেন। পারেন না ?

—না।

—সে কি ! যেতেই যদি চান তো আপনাকে আটকে রাখবে কে ? নিজের ইচ্ছেটাই হলো আসল কথা।

—না,—চিন্তিত বিষণ্ণ গলায় তিনি বললেন, তা সত্যি নয়।

—কিন্তু এখানে থেকেই বা আপনার লাভ কি ?

চট্ করে তিনি তার কোনো জবাব দিলেন না। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর ধীরে ধীরে বললেন :

—আমার প্রভুর তাই ইচ্ছে।

—প্রভু !—বারাব্বাস যেন চমকে উঠল।

—হ্যাঁ আমার প্রভু। তা তুমি অমন চমকে উঠলে কেন ? তুমি কি তাঁকে চেননা ?

—না।

—সে কি ! সত্যিই তাঁকে চেননা নাকি ? গলগথার পাহাড়ে কাল তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে। তাও শোননি ?

—ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে! কই, জানিনা তো। কিন্তু কেন, ক্রুশবিদ্ধ করা হলো কেন?

—এ তাঁর ভাগ্যলিপি।

—ভাগ্যলিপি! তাতে কি বলা হয়েছিল যে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হবে?

—হ্যাঁ। আর শুধু তাই নয়, নিজেও তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, একদিন তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়েই মৃত্যুবরণ করবেন। ধর্মগ্রন্থেও তার উল্লেখ ছিল।

—তাই নাকি? বারাব্বাস যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল। অস্ফুটকণ্ঠে শুধু জানাল যে, ধর্মগ্রন্থ সে কখনো পাঠ করেনি। তাই এসব জানেনা।

—আমিও পড়িনি। তবে শুনেছি সেখানে এর উল্লেখ আছে।

হবেওবা, বারাব্বাস ভাবল। তা সত্ত্বেও কিন্তু তার খট্‌কা গেল না। এমন কী তিনি করেছিলেন যে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করবার প্রয়োজন হলো? ব্যাপারটা তার অদ্ভুত লাগছে।

—আমারও লাগছে। কেন যে তিনি মৃত্যুবরণ করতে গেলেন, আমিও তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। মরলেনই যদি তো অমন বীভৎসভাবে মরতে গেলেন কেন? তবে হ্যাঁ, একটা কথা। নিজেই তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে এইভাবেই তাঁকে মরতে হবে। এ-মৃত্যু তাঁর ভাগ্যলিপি। ভাগ্যলিপিকে কেউ খণ্ডাতে পারে না।

বিষন্নভাবে তিনি মাথা দোলাতে লাগলেন। তারপর অস্ফুট গলায় বললেন:

—এ তিনি নিজেই জানতেন। বহুবার তিনি বলেছেন যে, আমাদের মঙ্গলের জন্যেই তাঁকে যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে,—আমাদের কল্যাণের জন্যেই তিনি মৃত্যুবরণ করবেন।

—আমাদেরই জন্যে? বারাব্বাস এবারে চোখ তুলে চাইল। দৃষ্টিতে তার বিস্ময় ফুটে উঠেছে।

—হ্যাঁ, আমাদেরই জন্যে। আমাদেরই জন্যে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি নির্দোষ, নিষ্পাপ। তা সত্ত্বেও যে তিনি এই তীব্র যন্ত্রণা সহ্য করে তারপর

ওই বীভৎস মৃত্যুকে বরণ করলেন, এ শুধু আমাদেরই জন্যে। তিনি অপরাধী নন, অপরাধী আমরাই। অপরাধের শাস্তি মৃত্যু। আমাদেরই তাই মরবার কথা। নিজের প্রাণ উৎসর্গ করে তিনি সেই অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে আমাদের বাঁচিয়ে দিয়ে গেলেন। আমাদের সর্ব অপরাধের শাস্তি তিনি তাঁর নিজের উপরেই তুলে নিয়েছেন।

স্তব্ধ হয়ে বসে রইল বারাব্বাস। দৃষ্টি তার পথের দিকে নিবদ্ধ। সে দৃষ্টি শূন্য, অর্থহীন।

—তাঁর কথার তখন অর্থ বুঝতে পারিনি। এখন পারছি। সব কিছুই এখন পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে।

—আপনি তাঁকে খুব ভালভাবেই চিনতেন বুঝি? বারাব্বাস শুধোল।

—হ্যাঁ, খুব ভালভাবেই চিনতাম। গোড়ার থেকেই আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম।

—আপনারা বুঝি একই জায়গার লোক?

সে-কথার তিনি কোনো উত্তর দিলেন না। আপন মনেই বলে চললেন,—যখনই যেখানে তিনি যেতেন, আমিও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছি।

—কেন?

—কেন? তাঁকে একবার দেখলে পর আর এ-প্রশ্ন তুমি করতে না।

—তার মানে?

—মানে আর অন্যকিছুই নয়, তাঁর একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। সে ক্ষমতা অলৌকিক। যখনই যাকে তিনি বলেছেন 'আমাকে অনুসরণ করো', তৎক্ষণাৎ সে তাঁকে অনুসরণ করেছে। তাঁর সেই নির্দেশ কেউ কখনো অমান্য করতে পারেনি। সে-এক আশ্চর্য ক্ষমতা। তাঁকে তুমি চেননা। চিনলে পর তুমিও সেই ক্ষমতার খানিকটা পরিচয় পেতে। বিনা বাক্যব্যয়েই তোমাকে তখন তাঁর অনুসরণ করতে হতো।

বারাব্বাস খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বলল:

—তা যদি সত্যি হয় তো তিনি এক আশ্চর্য লোক ছিলেন বলতে হবে।

কিন্তু, য়াহবা কেমন করে মেনে নি? অতোই যদি ক্ষমতা ছিল তো তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা পড়লেন কেন?

—ঐখানেই তোমার ভুল হচ্ছে। এ ভুল আমিও করেছিলাম। তার জন্যে এখন আমার অনুশোচনার অন্ত নেই। ব্যাপারটাকে পরে আমি বেশ ভালভাবে বিচার করে দেখেছি। আর-পাঁচজন জ্ঞানীগুণীর সঙ্গেও এ নিয়ে আমার কথা হয়েছে; তাঁর এই বীভৎস মৃত্যুর তাৎপর্য যে কী, তা নিয়ে তাই আর এখন আমার এতটুকুও সন্দেহ নেই। এই যে মৃত্যু, এ তিনি আমাদের জন্যেই বরণ করে নিয়েছেন। আমাদের কল্যাণেই নিজে নিরপরাধ হয়েও তিনি নরকযন্ত্রণা সহ্য করেছেন। কিন্তু হ্যাঁ, একদিন তিনি আবার ফিরে আসবেন; পূর্ণ গৌরবে তিনি ফের আত্মপ্রকাশ করবেন। তিনি আজ মৃত। কিন্তু সেদিন তিনি পুনর্জীবন লাভ করবেন। এ আমরা জানি।

—মৃত হয়েও পুনর্জীবন লাভ করবেন! কী বলছেন আপনি? আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে?

—কিছুমাত্র না। অনেকের ধারণা, আগামীকাল সকালেই তিনি পুনর্জীবিত হয়ে উঠবেন; তার কারণ, মৃত্যুর পর তৃতীয় দিনেই তাঁর নবজন্মলাভের কথা। তিনি নিজেই নাকি এ-কথা বলে গিয়েছেন। বলেছেন যে, মাত্র তিনদিন তিনি নরকে অবস্থান করবেন; তারপর আবার ফিরে আসবেন। আমি অবশ্য নিজের কানে এ-কথা শুনিনি। কিন্তু তাতে কি, আর-পাঁচজন শুনেছেন। আগামীকাল সূর্যোদয়ের মুহূর্তে…

অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে বারাব্বাস মাথা নাড়ল।

—তোমার বুঝি বিশ্বাস হচ্ছে না?

—না।

—কেমন করেই বা হবে। তুমি তাঁকে চেননা, তাই অবিশ্বাস করছ; চিনলে করতে না। আমরা তাঁকে চিনি, তাই বিশ্বাস করি। না-করবার কোনও কারণ নেই। অন্যের মৃতদেহে যিনি প্রাণসঞ্চার করতে পারেন, নিজে বেঁচে-ওঠা কি তাঁর কাছে খুব দুঃসাধ্য কাজ?

—মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার! তাও কি তিনি করেছেন নাকি?

—বিলক্ষণ; এ আমার স্বচক্ষে দেখা।

—সত্যি?

—সত্যি। ইচ্ছে করলে তিনি সবই করতে পারেন। সে ক্ষমতা তাঁর আছে। নিজের স্বার্থেও সেই ক্ষমতাকে তিনি কাজে লাগাতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি করেননি; কোনোদিনই করেননি। সেইটেই এক আশ্চর্য রহস্য। এতই যদি তাঁর ক্ষমতা ছিল তো অন্যের হাতে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন কেন? এ বড় কঠিন প্রশ্ন করেছ। আমিও এ-নিয়ে ভেবে দেখেছি, কিন্তু কোনো কূলকিনারা করে উঠতে পারিনি।

—সত্যিই কি আপনি বিশ্বাস করেন যে, তিনি ফের বেঁচে উঠবেন?

—নিশ্চয়ই করি। এ আমার বদ্ধমূল বিশ্বাস। তিনি যে ফের বেঁচে উঠবেন, তা নিয়ে আমার বিন্দুমাত্রও সংশয় নেই। আবার তিনি ফিরে আসবেন, আবার তাঁর পূর্ণ-মহিমায় আবির্ভূত হবেন। এ শুধু আমার কথাই নয়; যাঁরা জ্ঞানী, যাঁরা পণ্ডিত, তাঁরাও এ-কথা বিশ্বাস করেন। সে এক পরম লগ্ন। আর সেই পরম-লগ্ন থেকেই এক নবযুগের সূচনা হবে। মানবপুত্র তখন আপন হাতে তাঁর রাজ্যভার তুলে নেবেন।

—মানবপুত্র?

—হ্যাঁ, নিজেকে তিনি সেই নামেই অভিহিত করেছিলেন।

—মানবপুত্র…!

—হ্যাঁ, তাই। তবে অনেকে আবার বিশ্বাস করেন যে…কিন্তু না, তা আমি বলতে পারব না।

বারাব্বাস এবারে আরো খানিকটা ঘনিষ্ঠ হয়ে এল।

—কী তাঁরা বিশ্বাস করেন?

—বিশ্বাস করেন যে, বিশ্বাস করেন যে, তিনি স্বয়ং ঈশ্বরেরই পুত্র।

—ঈশ্বরেরই পুত্র?

—হ্যাঁ, তাই। কিন্তু তাও কি কখনো সত্যি হয়? শুনে আমার ভয়-ভয়

করত। তার চাইতে বরং যেমনটি তিনি ছিলেন তেমনটিই যদি ফিরে আসেন, তাহলেই আমি সবচাইতে খুশী হব।

বারাব্বাস ততক্ষণে অধৈর্য হয়ে উঠেছে! সে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল :

—যতো সব বাজে কথা। ঈশ্বরপুত্র হলে কি তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা যেত? ঈশ্বরপুত্র! আপনিও কি তাই বিশ্বাস করেন নাকি?

—না। সে-কথা আমি আগেই বলছি। চাওতো আমি আবারো বলতে পারি।

বারাব্বাস সে-কথায় কান দিল না। সে এখন অত্যন্তই উত্তেজিত। উত্তেজনায় তার চোখের নীচের সেই কাটা-দাগটি এখন লাল হয়ে উঠেছে। একটানা সে বলে যেতে লাগল :

—এ যারা বিশ্বাস করে তারা পাগল, তারা বদ্ধপাগল! যতো সব বুজরুকি!… ঈশ্বরপুত্র! এখানকার এই গাঁয়েগঞ্জে তিনি ধর্মপ্রচার করতে এসেছেন! যতো সব অসম্ভব কথা।

—না না, অসম্ভব হবে কেন, খুবই সম্ভব। আমি নিজে অবশ্য বিশ্বাস করিনা; কিন্তু এও জানি যে এটা অসম্ভব কিছু নয়। তুমি ভাবছ এত জায়গা থাকতে তিনি এখানে এলেন কেন? কেমন, এই তো? তা কোথাও না কোথাও তো তাঁকে আসতেই হতো? না হয় এখানেই এলেন, এখান থেকেই তাঁর কাজ শুরু করলেন! না না, এতে অবাক হবার কিছু নেই।

বারাব্বাসের ইচ্ছে হলো হো হো করে সে হেসে ওঠে। কিন্তু হাসলনা। নিজেকে তার এখন অবসন্ন লাগছে। গায়ে তার পশুচর্মের জামা, অধৈর্য হয়ে সে তার কাঁধের কাছটাতে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

—শুধু তা-ই নয়, তাঁর মৃত্যুর সময় যে সব আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে সে কথাটাও একবার ভেবে দ্যাখো।

—কিসের আশ্চর্য ব্যাপার?

—সে কি, তুমি জানোনা? চারদিক যে তখন অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল কেউ তোমায় তা বলেনি?

অন্তদিকে চোখ ফিরিয়ে নিল বারাব্বাস। সত্যিই তাহলে অন্ধকার নেমে এসেছিল?

—আর শুধু অন্ধকারই নয়, ভূমিকম্পও হয়েছিল তখন। গল্‌গথা পাহাড়ের উপরে ক্রুশটাকে যেখানে পোঁতা হয়েছিল, সে জায়গাটা ফেটে একেবারে চৌচির হয়ে গিয়েছে।

—হতেই পারে না। এ আপনি বানিয়ে বলছেন। কি করে আপনি জানলেন যে জায়গাটা ফেটে গিয়েছে? আপনি কি তা চাক্ষুষ দেখেছেন? আপনিও কি সেখানে ছিলেন নাকি? ওকি, অমন চুপ করে রইলেন কেন?

আর হঠাৎ সেই লোকটির মুখের চেহারা যেন আমূল পালটে গেল। মনে হলো তিনি লজ্জা পেয়েছেন, অস্বস্তি বোধ করছেন। বারাব্বাসের দিকে একবার তাকিয়েই তিনি তাঁর চোখ নামিয়ে নিলেন। ম্লানকণ্ঠে বললেন:

—নিজে আমি কিছুই দেখিনি। সত্যি-মিথ্যে কিছুই আমি জানিনা।

বহুক্ষণ আর তিনি কথা কইলেন না, চুপ করে বসে রইলেন। মাঝে মাঝে তাঁর দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়তে লাগল। তারপর এক সময় বারাব্বাসের গায়ের উপরে তিনি হাত রাখলেন। ধীরে ধীরে, প্রায় অস্ফুটস্বরে, বললেন:

—তিনি আমার প্রভু। কিন্তু এই বীভৎস মৃত্যুকে যখন তিনি বরণ করে নেন, তাঁর সেই নিদারুণ যন্ত্রণার সময়ে আমি উপস্থিত ছিলাম না। ভয়ে আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম। আমি তাঁকে পরিত্যাগ করেছিলাম। কারণ আমি ভীরু, প্রাণভয়টাই আমার কাছে বড় হয়ে উঠেছিল। আর শুধু তা-ই নয়, তিনি যে আমার প্রভু তা-ও আমি অস্বীকার করেছি। কী করে তিনি আমার ক্ষমা করবেন? আমার এই পাপের জন্যে যখন তিনি কৈফিয়ৎ চাইবেন, কী উত্তর আমি দেব?

লজ্জায় তিনি মুখ ঢেকে ফেললেন; নিরুদ্ধ একটা আবেগে তাঁর সর্বশরীর আন্দোলিত হতে লাগল।

—এ পাপ আমি কেন করলাম? কেমন করে করলাম?..

বহুক্ষণ পর তিনি মাথা তুললেন। বারাব্বাস দেখল, তাঁর সেই আয়ত নীল চক্ষু দুটি অশ্রুতে ভরে উঠেছে।

—কী আমার দুঃখ, তুমি জানতে চেয়েছিলে। এবারে জেনেছ। আমি যে কেমন লোক, তাও জেনেছ। আমার ঈশ্বর আর আমার প্রভুও তা জানেন। আমি ভীরু। আমি অপরাধী। আমার এই অপরাধ কি তাঁরা ক্ষমা করবেন?

বারাব্বাস তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে জানাল যে, নিশ্চয়ই তাঁরা তাঁকে ক্ষমা করবেন। তার অন্তত তা-ই বিশ্বাস। এ-কথা সে অতো ভেবেচিন্তে বলেনি; বললে তিনি খুশী হবেন, তাই বলল। আর তা ছাড়া অনুতপ্ত এই লোকটিকে তার ভালোই লেগেছে; যদিও, কেন যে তাঁর এই অনুতাপ, তা সে জানে না। এমন কোনও অপরাধ তিনি করেননি যে এত মুষড়ে পড়তে হবে। আত্মরক্ষার জন্যে তিনি তাঁর সঙ্গীকে পরিত্যাগ করেছিলেন। কে না করে?

বারাব্বাসের হাত দুটিকে তিনি তাঁর মুঠোয় তুলে নিলেন। তারপর অশ্রুভারাক্রান্ত গলায় তাকে সেই একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন:

—সত্যিই কি তাঁরা আমাকে ক্ষমা করবেন? সত্যি বলছ তুমি?

রাস্তা দিয়ে একদল লোক যাচ্ছিল তখন। লোহিতশ্মশ্রু দীর্ঘকায় সেই লোকটিকে দেখে তারা কাছে এগিয়ে এল। বারাব্বাসের উপরে তাদের নজর পড়েনি প্রথমটায়। এবারে পড়ল। মনে হলো তারা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছে। বিস্ময় কাটতেই তারা চেঁচিয়ে উঠল:

—এ-কি, এ আপনি কার সঙ্গে কথা কইছেন? একে কি আপনি চেনেন না?

শান্তগলায় তিনি বললেন:

—না। একে আমি চিনি না। তবে হ্যাঁ, এ বড় দয়ালু মানুষ, দু দণ্ড কথা কয়ে আমি বড় শান্তি পেয়েছি।

—সে-কি, এ-ই যে সেই লোক! এরই বদলে যে আমাদের প্রভুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে!

বারাব্বাসের হাত দুটি তাঁর মুঠোর মধ্যেই বন্দী হয়ে ছিল। তৎক্ষণাৎ তিনি সরে দাঁড়ালেন। হাত দুটিকে তিনি মুক্ত করে দিলেন। মনে হলো তিনি ভয় পেয়েছেন; তাঁর সেই ভীতসন্ত্রস্ত ভাবটিকে যেন আর লুকিয়ে রাখতে পারছেন না। অন্যান্যরাও ভয়ার্ত; তবে সেই ভয়কে তারা লুকিয়ে রাখেনি। রাখবার কোনো চেষ্টাও

করেনি। উত্তেজনায় তারা হাঁপাচ্ছে। বারাব্বাসকে তারা পরিহার করতে চায় সে এখন চলে গেলেই তারা বাঁচে।

ধীরে ধীরে সে উঠে দাঁড়াল; লজ্জায় কুণ্ঠায় সে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল।

সমস্বরে সবাই চেঁচিয়ে উঠল হঠাৎ:

—দূর হও নাস্তিক! দূর হও!

এরই জন্যে বোধ হয় অপেক্ষা করছিল বারাব্বাস। জামাটাকে গায়ে চাপিয়ে নিয়ে তারপর ধীরে ধীরে সে গিয়ে রাস্তায় নামল। নিঃসঙ্গ রৌদ্রদগ্ধ পথ। একা একা সে সামনে এগিয়ে চলেছে! একবারো সে পিছনে তাকাল না।

ঠোঁট-কাটা সেই মেয়েটির সে-রাত্রে ঘুম এল না। একটু বাদেই রাত পোহাবে, সূর্য উঠবে। কী-এক অলৌকিক কাণ্ড ঘটবে তখন, নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে তাকিয়ে সে তাই চিন্তা করতে লাগল। আজ আর সে ঘুমোবে না; সারারাত সে জেগে থাকবে।

ভাঙ্ গেটের বাইরে একটা গর্তমতন জায়গা; খড়কুটোর শয্যা পেতে সে সেখানে শুয়ে আছে। আশপাশে রুগ্ন ভিখারীদের গোঙানি শোনা যাচ্ছে। ঘুমের মধ্যেও তাদের শান্তি নেই। কুষ্ঠরোগী একটি ভিক্ষুকও থাকে এখানে। ব্যাধির যন্ত্রণা যখন অসহ্য হয়ে ওঠে, সে আর তখন শুয়ে থাকতে পারে না; যন্ত্রণায় উঠে দাঁড়ায়। তার ঘণ্টাটির থেকে তখন টুংটাং শব্দ ভেসে আসে। মেয়েটি এখন সেই শব্দ শুনতে পাচ্ছে। চতুর্দিকে স্তূপীকৃত আবর্জনা; বাতাসে তার দুর্গন্ধ ছড়িয়ে গিয়েছে। গন্ধটা আগে অসহ্য লাগত, দম আটকে আসত। এখন আর আসে না। সবকিছুই এখন তার সহ্য হয়ে এসেছে। কারুরই বোধ হয় আর কোনো অসুবিধে হয় না।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই···সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই·

কি হবে? রোগীরা সব সুস্থ হয়ে উঠবে; অভুক্তরা সব খেতে পাবে।

কথাটা যেন বিশ্বাস হতে চায় না। এ-ও কি সম্ভব? স্বর্গের দরজা খুলে যা
দেবদূতরা সব পৃথিবীতে নেমে এসে সবাইকে খাদ্য বিলিয়ে যাবে। সবাইকে
সবাইকে না হোক, গরীবদের তারা খাওয়াবেই। বড়লোকরাও অবশ্য অ
থাকবে না। আর যারা গরীব, সত্যিই যারা ক্ষুধার্ত, দেবদূতরা এসে ত
খাইয়ে যাবে। এখানে এই ডাঙ্ গেটের সামনেকার এই জমির উপরে শাদা
বিরাট একখণ্ড কাপড় বিছিয়ে দেওয়া হবে। তার উপরে পরিবেষণ করা
খাদ্য। তারপর সবাই খেতে বসবে। সবাই। কেউই তার থেকে বাদ যাবে
বিশ্বাস করাটা একটু শক্ত। কিন্তু শক্তই বা কেন? সব কিছুই
পালটে যাবে, কোনো কিছুই আর এই আজকের মতো থাকবে না। কো
কিছুই না।

তার এই পোষাকটাও কি তখন পালটে যাবে? হয়তো শাদা
যাবে, কিংবা হয়তো নীল। ঈশ্বরপুত্র পুনর্জীবন লাভ করবেন; তাই
নতুন যুগের সূচনা হবে।···পালটে দেবেন, সব কিছুকেই তিনি প
দেবেন।

শুয়ে শুয়ে সে তাই চিন্তা করতে লাগল।

কাল···কাল সকালে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই···। তার ভাগ্য ভাল যে
সে শুনতে পেয়েছে।

কুষ্ঠরোগীর ঘণ্টাধ্বনি এবারে কাছে এগিয়ে এসেছে। লোকটাকে সে চে
দিনের বেলায় কেউ তাকে এখানে আসতে দেয় না। শুধু যে তাকেই দেয় না
নয়, কাউকেই না। উপত্যকার নীচের দিকে খানিকটা জায়গা তাদের
আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। সেইখানেই তারা থাকে। রাত্তিরে সে লু
লুকিয়ে এখানে উঠে এসেছে। লোকটি এখন একজন সঙ্গী চায়; জীবন্ত মানু
সান্নিধ্য চায়। মেয়েটিকেও সে-কথা সে একদিন বলেছিল। তারার আ
আলোয় তাকে আসতে দেখা যাচ্ছে।

মৃত্যুপুরী···সে জায়গা কেমন? সেইখানেই তিনি এখন রয়েছেন। লো
অন্তত তাই বলে। কেমন চেহারা জায়গাটার? সে তা জানে না।

পাশে যে-লোকটি শুয়ে আছে, সে শুধু বুড়োই নয়, অন্ধও। ঘুমের ম একবার কঁকিয়ে উঠল। খানিক এগিয়ে রুগ্ন একটি যুবক। শুয়ে শুরে হাঁপাচ্ছে। সারাক্ষণ তার সেই শ্বাস টানার শব্দ শোনা যায়। তার গ্যালিলির এক বুড়ী। একটা হাত তার অনবরত শুধু কাঁপে। ওর উপরে কিসের ভর হয়েছে। আশপাশের লোকদের ধারণা, ঝরণার কাছ থেকে যদি খানিকটা কাদামাটি এনে তাদের শরীরে তা ছুঁইয়ে দেয়, তাহলেই তারা হয়ে উঠবে। আবর্জনার থেকে এরা খাবার খুঁটে খায়। এরা ক্ষুধার্ত। তাতে কি। কাল থেকেই এদের দুঃখ ঘুচবে। ঘুমের মধ্যেও এরা গোঙাচ্ছে। কাল থেকে আর গোঙাবে না। সব যন্ত্রণার তখন অবসান মেয়েটির আর আজ তাই কিছুমাত্রও দুঃখ নেই।

স্বর্গের থেকে দেবদূতেরা সব নেমে আসবে। তাদের নিঃশ্বাস লেগে জল পবিত্র হয়ে উঠবে। সে জলে অবগাহন করলে কোনো রোগেরই আর চিহ্ন থাকবে না।…কুষ্ঠরোগীরাও কি ভাল হয়ে উঠবে? নিশ্চয় উঠবে। কিন্তু তাদেরও সেই ঝরণার জলে স্নান করতে দেওয়া হবে তো? সত্যিই হবে? কেউ তাদের কোনো বাধা দেবে না? ভাবতেই যেন কেমন লাগে। ভারী অবাক লাগে।

কিংবা, এমনও হতে পারে, ঝরণার জলের হয়তো কিছুই হলো না। নিয়ে কেউ মাথাও ঘামাবেনা বোধ হয়। স্বর্গের দূতরা হয়তো বাতাসে ভর এই গে-হিনম্ উপত্যকা, শুধু এই উপত্যকাই নয়—সারা পৃথিবীটাকেই এ প্রদক্ষিণ করে আসবে। আর তাদের পাখার অবিশ্রান্ত ঝাপটে হাওয়ায় হা যে ঝড় উঠবে, সেই ঝড়ের নিঃশ্বাসে বোধ হয় রোগ শোক আর দুর্ভাগ্য—কে কিছুরই আর কোনো চিহ্ন থাকবে না।

শুয়ে শুয়ে সে তাই ভাবতে লাগল সারাক্ষণ। ঘুম এল না।

প্রথম যেদিন সে ঈশ্বরপুত্রকে দেখেছিল, সেই দিনটির কথা এখন তার পড়ছে। অত করুণা সে আর কারুর কাছে পায়নি। ইচ্ছে করলেই সে তাঁ তার দুঃখমোচনের জন্যে অনুরোধ করতে পারত। তা সে করেনি। ক

চায়নি। অনায়াসেই তিনি তাকে সারিয়ে তুলতে পারতেন ; সে-ক্ষমতা যে ছিল, তা সে জানে। তবু সে তাঁকে বিরক্ত করেনি। সত্যিই যারা দুঃখী, সত্যি যারা দুঃস্থ, তাদের সকলকেই তিনি সাহায্য করতে চেয়েছিলেন। তিনি মহৎ। কেন তাঁকে তার নিজের কথা বলে বিরক্ত করতে যাবে ? এইজন্যেই সে কো উপকার চায়নি।

তাঁর কথাগুলি তার এখন মনে পড়ছে। আর লজ্জা হচ্ছে। রাস্তা একপাশে ধুলোর মধ্যেই সে নতজানু হয়ে বসেছিল ; দেখে তিনি এগিয়ে এসে শান্ত গলায় বললেন :

—তুমিও কি আমার কাছে আশ্চর্য-কিছু প্রত্যাশা করো ?

—না, প্রভু, না। আমি শুধু আপনাকে দেখতে এসেছি। অন্য আর কোন প্রত্যাশাই আমার নেই।

শুনে তিনি মুখ তুলে চাইলেন। বিষাদ-শান্ত দৃষ্টির আলোকে তার সমস্ত বেদনা তিনি মুছিয়ে দিলেন। তারপর তার চিবুক স্পর্শ করে বললেন :

—তুমি আমার সাক্ষী রইলে।

অদ্ভুত ! সবকিছুই তার অদ্ভুত লাগছিল। কথাটার মানে কী ? সাক্ষী রইলে ! কিসের সাক্ষী ? কিসের হয়ে সে সাক্ষ্য দেবে ? কেমন করে দেবে অবিশ্বাস্য।

তার কথাগুলিকে উপলব্ধি করতে তাঁর এতটুকুও অসুবিধে হয়নি। কেন বা হবে ? তিনি যে ঈশ্বরপুত্র।

সবই তার আবার মনে পড়ছে এখন। তাঁর চোখের সেই ম্লানবিষণ্ণ দৃষ্টি, তাঁর হাতের সেই মধুর সৌরভ, তা-ও।...নীল আকাশের দিকে সে এখন তাকিয়ে আছে ; আর তার বিস্ফারিত দুই চোখে এসে নক্ষত্রের ছায়া পড়ছে। আঃ এ-যে অনেক নক্ষত্র। বাড়ি ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়বার পর সে অনেক নক্ষত্র দেখেছে। অনেক, অনেক।...আচ্ছা ওই নক্ষত্রগুলি আসলে কী ? সে তা জানে না। শুধু জানে যে ঈশ্বরই ওদের সৃষ্টি করেছেন। মরুভূমির উপরে যে আকাশ, সে-আকাশে অনেক নক্ষত্র ; পাহাড়ের উপরে যে আকাশ, সেখানেও।

গিলগলের পাহাড়েও। সে রাতে কিন্তু সেখানে একটিও নক্ষত্র ছিল একটিও না।

তার বাবার এখন বাড়ির কথা মনে পড়ছে। দু-পাশে দুটি দেবদারু মাঝখানে তাদের বাড়ি। মাথার উপরে এক তীব্র অভিশাপ নিয়ে সে পাহাড়ের গা থেকে নেমে আসছিল, মা তখন দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন। দিকে তিনি তাকিয়ে ছিলেন। বাড়ির থেকে তাকে বার করে দেওয়া ছাড়া কী করবেন তাঁরা, এছাড়া তাঁদের আর-কোনো উপায় ছিল না। তা থেকেই তার এই দুর্দশার শুরু। বসন্তাগমে ক্ষত-যাতনায় তখন হয়ে উঠেছে। সে-কথাও তার এখন মনে পড়ল। মনে পড়ল যে মা তার ছায়াচ্ছন্ন দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন; যে-লোকটি সেই অভিশাপ উচ্চারণ করেছিল, তার কাছ থেকে যেন আত্মগোপন করতে চাইছিলেন তিনি।

কিন্তু এখন আর তা নিয়ে কোনো দুঃখ নেই; সবকিছুই এখন সহ্য এসেছে।

অন্ধ লোকটি ততক্ষণে ঘুমের থেকে জেগে উঠেছে। কুষ্ঠরোগীর সেই ঘন্টা বোধ হয় কানে পৌঁচেছে ওর।

—দূর হ! দূর হ এখান থেকে!—অন্ধকারেই সে চেঁচিয়ে উঠল—দূর এখানে তোর কী দরকার।

ধীরে ধীরে, রাত্রির আবছায়া অন্ধকারের মধ্যে, মিলিয়ে গেল সেই ঘন্টাধ্বনি অন্ধ তখন ফের শুয়ে পড়ল। কিন্তু চুপ করল না, চোখের উপরে হাত রেখে বিড়বিড় করতে লাগল।

···মৃত্যুর পরে শিশুরাও কি সেই মৃত্যুপুরীতে গিয়ে পৌঁছয়? তা-ই হবে হয়। কিন্তু যারা ভূমিষ্ঠই হয়নি, মাতৃজঠরেই যারা মারা গিয়েছে, তারা? তা কি যায় নাকি সেখানে? না না, তা সম্ভব নয়। তারা কি অত যন্ত্রণা সইতে পারে? তাদের নিশ্চয়ই নেয় না। না কি তাদেরও নিয়ে যায়? সে তা জানে না·· কিছুই জানে না··।

—তোমার সন্তান অভিশপ্ত হোক··।

নতুন যুগের সূর্যোদয় হতে চলেছে। এবারে নিশ্চয়ই তারা শাপমুক্ত হবে? হয়তো বা তারা···কে জানে তা সত্যি কিনা···।

তোমার···সন্তান···অভিশপ্ত হোক্।

মনে পড়তেই সে শিউরে উঠল। আজকের এই রাত্রি কি আর পোহাবে না। কত দেরি সেই সূর্যোদয়ের! ··মনে হলো যেন যুগযুগান্তকাল সে এই বিনিদ্র শয্যায় শুয়ে আছে, সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষা করছে।···রাত্রি কি প্রায় শেষ হয়ে এল? তাই হবে। মাথার উপরকার নক্ষত্রগুলি এখন বহুদূরে সরে গিয়েছে; বাঁকা চাঁদ গিয়ে পাহাড়ের আড়ালে মুখ লুকিয়েছে। শহরের প্রাচীরটিকে এখান থেকে আবছা-আবছা দেখা যায়। এবার নিয়ে তিনবার সেখানে সে মশাল জ্বলে উঠতে দেখেছে। তার মানে, শেষবারের মতো ওখানে প্রহরী-বদল হলো। রাত্রি তাহলে শেষ হয়ে এসেছে। শেষ রাত্রি···।

মাউণ্ট অব অলিভের উপরে প্রভাতী তারাটি তার চোখে পড়ল। উজ্জ্বল ঝকঝকে নক্ষত্র, ঈষৎ বড়। ও-নক্ষত্রটি সে চেনে। কিন্তু আজ যেন ওটিকে বড়-বেশী উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। এত দীপ্তি সে আর কখনো দেখেনি। হাত দুটিকে সে তার শীর্ণ বুকের উপরে জড়ো করে আনল; তারপর যুক্তকরে ওই প্রভাতী তারাটির দিকেই সে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। দু চোখে তার এক আশ্চর্য আভা জ্বলে উঠেছে।

তারপরেই হঠাৎ উঠে দাঁড়াল মেয়েটি, দ্রুতপায়ে কয়েক পা' সামনে এগিয়ে গিয়েই নিবিড় অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

রাস্তার ওপাশে একটি কাঁটাঝোপ; বহুক্ষণ ধরে একটি লোক সেখানে আত্মগোপন করে বসে রয়েছে। ক্রুশবিদ্ধ লোকটিকে যেখানে সমাহিত করা হয়েছিল সে-জায়গাটিকে ওখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। সেই দিকেই সে তাকিয়ে আছে। লোকটি আর অন্য কেউই নয়, বারাব্বাস। মনে মনে সে অধৈর্য হয়ে উঠেছে। আজকের এই রাত্রি বুঝি আর শেষ হবে না।

মৃতের পক্ষে যে পুনর্জীবন লাভ সম্ভব নয় তা সে জানে। তা সত্ত্বেও সে

অপেক্ষা করছে। ব্যাপারটাকে সে আজ যাচাই করে নেবে। রাত থাকতে থাকতেই তাই সে এখানে চলে এসেছে, কাঁটাঝোপের আড়ালে বসে সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষা করছে। নিজের আচরণে সে নিজেই ঈষৎ বিস্মিত। কেন সে এল এখানে? কী তার এমন দরকার পড়েছিল? যা-ই হোক্, আর না-ই হোক্, তার তাতে কী? সে কেন এই উদ্ভট ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে?

একটু বাদেই সেই অলৌকিক কাণ্ড ঘটবার কথা। বারাব্বাস তাই আশা করেছিল, অনেকেই তা দেখতে আসবে। সেইজন্যেই সে লুকিয়ে আছে; অন্য কেউ তাকে দেখে ফেলুক, তা সে চায় না। কেউই কিন্তু আসেনি, কেউই না। বারাব্বাসের কেমন অস্বস্তি লাগতে লাগল।

কিন্তু না, ওই তো, তার একটু সামনেই, রাস্তার ঠিক মাঝখানেই যেন কে নতজানু হয়ে বসে রয়েছে। কী আশ্চর্য, সে তো কারুর পায়ের শব্দ শোনেনি। তাহলে ও এল কখন? স্পষ্ট করে কিছু বোঝা যায় না; তবে পোষাকের থেকে মনে হয় স্ত্রীলোক। প্রার্থনার ভঙ্গীতে সে বসে রয়েছে। অস্পষ্ট আর ধূসর একটি ছায়ামূর্তি।

ধীরে ধীরে আলো ফুটে উঠছে। একটু বাদেই সূর্যের প্রথম রশ্মি এসে সমাধিস্থানের উপরে বিদ্ধ হলো। সমাধিগহ্বর শূন্য, উন্মুক্ত। যে বিরাট পাথর-খণ্ডটি দিয়ে তার মুখ আটকে রাখা হয়েছিল, কে যেন সেটি সরিয়ে দিয়েছে।

এ-ও কি সম্ভব! স্তম্ভিত হয়ে গেল বারাব্বাস। নির্বাক স্তব্ধ চোখে সে শুধু সেই শূন্য গহ্বরের দিকে তাকিয়ে রইল। ক্রুশবিদ্ধ লোকটিকে ওখানে সমাহিত করা হয়েছিল, তা সে স্বচক্ষে দেখেছে। বিরাট ওই পাথরখণ্ডটি দিয়ে সমাধিগহ্বরের মুখ রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, তা-ও দেখেছে। তাহলে?

একটু বাদেই তার হুঁশ হলো। আসলে এ-কিছু অলৌকিক কাণ্ড নয়। তার এখানে আসবার অনেক আগেই নিশ্চয় ওই পাথরটিকে ওখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে; সমাধিগহ্বরও নিশ্চয়ই এইমাত্র শূন্য হয়নি, বহুক্ষণ ধরেই শূন্য পড়ে আছে। কারা যে ওই পাথরটিকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে, আর কারাই বা তার মৃতদেহটিকে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে, তাও সে এবারে অনুমান করতে পারল। এ

নিশ্চয়ই তাঁর শিষ্যদেরই কাণ্ড! রাতের অন্ধকারেই যে তারা কাজ হাসিল করে গিয়েছে, তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই। সকলকে এখন তারা বুঝিয়ে বেড়াবে যে, প্রভু তাদের পুনর্জীবন লাভ করেছেন।

কথা ছিল, আজ সূর্যোদয়ের সময়েই সেই অলৌকিক কাণ্ড ঘটবে। তাঁর শিষ্যেরাই সে-কথা বলেছিল। অথচ নিজেরাই তারা আসেনি। কেন আসেনি, বারাব্বাস তা স্পষ্টই বুঝতে পারল। বুঝতে পারল যে, শিষ্যেরা একেবারে সাধু সাজতে চাইছে।

এক-পা' এক-পা' করে বাইরে বেরিয়ে এল বারাব্বাস। সমাধিগহ্বরটিকে সে আর-একটু কাছে গিয়ে দেখবে। অস্পষ্ট সেই ছায়ামূর্তিটি তখনো পথের উপরেই বসে রয়েছে। আর এক-পা' এগিয়েই সে অবাক হয়ে গেল। কী আশ্চর্য, এ-যে সেই ঠোঁটকাটা মেয়েটি। বারাব্বাস আর এগোল না; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে লাগল। নিষ্পলক বিহ্বল চোখে মেয়েটি সেই শূন্যগহ্বর সমাধির দিকে তাকিয়ে রয়েছে। অন্য আর কিছুকেই, অন্য আর কাউকেই সে দেখতে পাচ্ছে না। ঠোঁট দুটি অল্প একটু খোলা; উপরের ঠোঁটের কাটা দাগটিকে এখন অস্বাভাবিক ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। মেয়েটি তাকে দেখতে পায়নি।

বারাব্বাস যেন লজ্জা পেল। এমনভাবে যে ওকে দেখতে পাওয়া যাবে, তা সে ভাবতেই পারেনি। আর-একটি দিনের কথাও তার মনে পড়ল হঠাৎ; সে-দিনও কিন্তু মেয়েটির মুখ ঠিক এমনিই বিহ্বল দেখাচ্ছিল। আর বারাব্বাসও সেদিন ঠিক আজকের মতই লজ্জা পেয়েছিল।—নাঃ, সে-সব কথা নিয়ে সে আর আজ মাথা ঘামাবে না।

মেয়েটিও এবারে তাকে দেখতে পেয়েছে; দু-চোখে তার বিস্ময় ফুটে উঠেছে। সে যে এখানে আসবে মেয়েটি তা বোধ হয় আশাই করেনি। বারাব্বাস নিজেই কি পেরেছিল? নিজেই কি সে কিছু কম বিস্মিত?

বারাব্বাস যদি এমন একটা ভান করতে পারত যে সে কিছুই জানে না, নেহাৎই ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পড়েছে, জায়গাটার নাম পর্যন্ত সে জানে না, এমনকি এখানে যে কারুর সমাধি আছে তাও না,—তাহলে হয়তো সে খুশিই

হতো। কিন্তু ভাব করা কি এতই সোজা? বললেই বা কে মেয়েটি কি তা বিশ্বাস করবে? করবে না। বারাব্বাস তা জানে। তা সত্ত্বেও সে আজ চোখেমুখে খানিকটা নিরীহভাব ফুটিয়ে তুলে প্রশ্ন করল।

—একি, তুমি! তুমি যে এখানে বসে রয়েছ?

প্রশ্নটা যেন তার কানেই গেল না। এমন কি, সে একটু নড়লনা পর্যন্ত। বিহ্বল বিস্ফারিত তার চক্ষু, দৃষ্টি তার সমাধিগহ্বরের দিকে নিবদ্ধ। সেই দিকে তাকিয়েই ধীরে ধীরে, যেন আত্মগতভাবে সে একসময় বলে উঠল:

—ঈশ্বরপুত্র পুনর্জীবন লাভ করেছেন…

সামান্ত কয়েকটি কথা; কিন্তু আশ্চর্য, তাতেই যেন বারাব্বাসের কেমন অস্বস্তি লাগতে লাগল। কী একটা দুর্বোধ্য অনুভূতি যেন তার শিরায় শিরায় জড়িয়ে উঠছে। তা সে চায়না, তা সে চায়না। মুহূর্তকাল সে স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে রইল। তারপর একটু সামলে উঠে এগিয়ে গেল সেই সমাধিগহ্বরের দিকে। শূন্যগহ্বর সমাধি; মৃতদেহের কোনো চিহ্ন পর্যন্ত সেখানে নেই। কিন্তু তাতে কি। এ সে আগেই টের পেয়েছিল। ফিরে এসে দেখল মেয়েটি তখনও সেই একইভাবে বসে রয়েছে; ভক্তি আর আনন্দে সারামুখ তার উদ্ভাসিত। বারাব্বাসের দুঃখ হলো। বোকা মেয়ে, এতের কারসাজিটা সে বুঝতে পারেনি। কারসাজিটা বারাব্বাস ধরিয়ে দিতে পারে— এক্ষুণি দিতে পারে। কিন্তু থাক। এমনিতেই সে তাকে অনেক দুঃখ দিয়েছে। আর দুঃখ দেবেনা। আর তাই, যেন কিছুই জানেনা, এমনিভাবেই সে শুধোল:

—ক্রুশবিদ্ধ সেই লোকটি বুঝি বেঁচে উঠেছে? কেমন করে বাঁচল?

বিস্মিতভাবে মেয়েটি তার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। বারাব্বাস কি কিছুই জানেনা? একটু আগেই স্বর্গের থেকে অগ্নিবসন এক দেবদূত এখানে নেমে এসেছিলেন। দু বাহু তাঁর সম্মুখে প্রসারিত। বাহু তো নয়, যেন বর্শাফলক। আর সেই বর্শাফলক এসে ওই সমাধিস্থানের উপরে বিদ্ধ হলো; উন্মুক্ত হলো তার আবরণ। এই অলৌকিক দৃশ্য সে তার নিজের চোখেই দেখেছে। কেন, বারাব্বাস কি তা দেখতে পায়নি?

বারাব্বাস বলল, সে দেখতে পায়নি।

অস্বাভাবিক কোনো কিছু যে তাকে দেখতে হয়নি বারাব্বাস তাতে নিশ্চিন্ত বোধ করল। চোখ দুটি তার সেরে উঠেছে তাহলে। নিশ্চয়ই সেরে উঠেছে। তার প্রমাণ, আগের মতো আর তার দৃষ্টিবিভ্রম হয়নি এবারে। সে আর সেই ক্রুশবিদ্ধ লোকটির ইচ্ছার বশীভূত নয়, সে এবারে মুক্ত। মেয়েটি কিন্তু উঠল না; সেই একইভাবে, প্রার্থনার ভঙ্গীতেই সে বসে রইল। একটু আগেই সে যা দেখেছে তারই স্মৃতিতে তার দুই চক্ষু দীপ্তিময়!

বহুক্ষণ বাদে সে উঠে দাঁড়াল। যে পথটি এখান থেকে শহরের দিকে চলে গিয়েছে, সেই পথেই তারা পাশাপাশি হেঁটে চলল কিছুক্ষণ। পথে আর তাদের বিশেষ কিছু কথা হলো না। তবে যেটুকু হলো, তার থেকেই বারাব্বাস বুঝতে পারল যে, ক্রুশবিদ্ধ সেই মানুষটির ঐশ্বরিক ক্ষমতায় মেয়েটির প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মেছে; মেয়েটি তাকে ঈশ্বরপুত্র বলে উল্লেখ করছে। কী সে প্রচার করত কথাপ্রসঙ্গে বারাব্বাস তা একবার জিজ্ঞেস করেছিল। মেয়েটি তার কোনো জবাব দেয়নি; প্রশ্নটাকে সে এড়িয়ে গিয়েছে।

পথের মোড়ে এসে তারা থেমে দাঁড়াল কিছুক্ষণ। মেয়েটি যাবে হিনম উপত্যকার পথে, আর বারাব্বাস যাবে গেট অব ডেভিডের দিকে। সেইখানে সেই পথের উপরে দাঁড়িয়ে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেবার আগে আবারো বারাব্বাস তাকে একই প্রশ্ন শুধোল:

—কী সে প্রচার করতো? কী?

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল মেয়েটি। লাজুকের মতো বারাব্বাসের দিকে একবার তাকিয়েই সে তার চোখ নামিয়ে নিল। তারপর তার সেই অদ্ভুত গলায় বলল:

—পরস্পরকে ভালবাসো।

সে আর দাঁড়াল না।

জেরুসালেমে তার কোনই কাজ নেই, তা সত্ত্বেও সে সেইখানেই রয়ে গেল। কেন, তা সে জানে না। নিজেকে এ নিয়ে প্রশ্ন করেছে বারাব্বাস, কিন্তু কোনো জবাব পায়নি। কাজকর্মেও তার কিছুমাত্র মন নেই। সে এখন শুধু উদ্দেশ্যহীনের মতো এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়। বন্ধুবান্ধবরা তাকে তাদের পাহাড়ের আস্তানায় যাবার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে গিয়েছিল; তাও সে যায়নি। তার এই দেরিতে যে তারা বিস্ময়বোধ করছে, বারাব্বাস তা জানে। জানে, তবু যায় না। এ-এক অদ্ভুত রহস্য। এবং এ-রহস্যের সে নিজেও কোনো কূলকিনারা খুঁজে পায়নি।

স্থূলাঙ্গিনী সেই মেয়েটি ভেবেছিল, তারই টানে বোধ হয় বারাব্বাস এখান থেকে নড়তে পারছে না। সে ভুল তার ভেঙে গিয়েছে। তাতে তার একটু অভিমান হয়েছিল প্রথমটায়। পরে সে বুঝতে পেরেছে যে, মান-অভিমানের এখানে প্রশ্নই ওঠে না। পুরুষমাত্রেই অকৃতজ্ঞ; বিশেষ করে সেইসব পুরুষ, অনায়াসেই যারা তাদের বাঞ্ছিত বস্তুটিকে পেয়ে গিয়েছে। অভিমানকে মনে না দেবার আর-একটা হেতু, শয্যাসঙ্গী হিসেবে বারাব্বাসকে তার অত্যন্তই ভাল লাগে। এমন পুরুষকেই আদর করে সুখ। আর তা ছাড়া, তার উপরে যদিও বারাব্বাসের এখন আর তেমন টান নেই, অন্য আর কারুর প্রতিও যে নেই, তা সে জানে। কাউকেই সে গ্রাহ্য করে না, কখনো করেনি। এবং যে-পুরুষ অন্য কোনো মেয়ের প্রতি আসক্ত নয়, সে যদি একটু দুঃখও দেয় তো ক্ষতি কী। এক-এক সময় অবশ্য নিজেকে ভারী অসহায় মনে হয়, কেমন যেন কান্না পায় তখন। তা থাক, কান্নাতেও কি সুখ নেই? থাকতে পারে না? জীবনে অনেকবার, অনেকের সঙ্গেই মেয়েটি প্রেমে পড়েছে; দুঃখ পেয়েছে। প্রেমকে সে আর তাই তাচ্ছিল্য করে না।

কিন্তু কেন যে বারাব্বাস জেরুসালেমেই রয়ে গেল, কেন যে সে এমন ছন্নের

মতো ঘুরে বেড়ায়, অনেক ভেবেও সে তার কোনো হদিশ পায়নি। বারাব্বাস, আর যাই হোক, অকর্মণ্য নির্জীব পুরুষ নয়। বরং বলা যায় ভয়ঙ্কর কর্মঠ। তার সেই কর্মঠ জীবনে কোনো বিপদকেই সে এতদিন বিপদ বলে গ্রাহ্য করেনি। সেই লোক এখন চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে আছে, নিষ্কর্মার মতো সময় কাটাচ্ছে। এ ভারী অস্বাভাবিক।

সেই অদ্ভুত ঘটনার পর থেকে, ক্রুশবিদ্ধ হতে-হতে ছাড়া পেয়ে যাবার পর থেকেই, তার এই ভাবান্তর ঘটেছে। গ্রীষ্মের দুপুরবেলায় চুপচাপ শুয়ে শুয়ে মেয়েটি তাই ভাবছিল। ভাবতে ভাবতেই সে একসময়ে হেসে উঠল। বারাব্বাস কি তার এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যকে এখনো ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না?

ক্রুশবিদ্ধ লোকটির শিষ্যদের সঙ্গে প্রায়ই সাক্ষাৎ হয় বারাব্বাসের। সাক্ষাৎকারটা স্বেচ্ছাকৃত নয়, আকস্মিক। রাস্তাঘাটে কিংবা হাটে-বাজারে তাদের সঙ্গে দেখা হয়। দেখা হলেই দু'দণ্ড তাদের সঙ্গে কথা কইতে সাধ যায়, সেই লোকটি আর তার অদ্ভুত আদর্শের সম্পর্কে আরও কিছু জানতে ইচ্ছে করে। পরস্পরকে ভালবাসো…? বারাব্বাস আর আজকাল মন্দিরের ওদিকে যায় না, আশপাশের বড় রাস্তাগুলিকেও সে পরিত্যাগ করেছে। সে এখন শুধু শহরের নীচের দিককার এই গলিঘুঁজিতেই সারাদিন ঘুরে বেড়ায়। এখানকার এই কর্মব্যস্ত কারিগর আর ফেরিওয়ালারা ভারী সরল মানুষ। আর এদের মধ্যে অনেকেই যে সেই ক্রুশবিদ্ধ লোকটির ঐশ্বরিক ক্ষমতায় বিশ্বাসী, তা-ও বারাব্বাস জানতে পেরেছে। তোরণের নীচে যাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তাদের চাইতে এরা অনেক সরল। এই দরিদ্র লোকগুলিকেই তার বেশী ভাল লাগে। তাই বলে এদের কথাবার্তায় যে তার কিছু আস্থা জন্মেছে তা নয়। কী যে বলে লোকগুলি, আর কেমন বোকার মতন বলে, বারাব্বাসের তা ঠিক বোধগম্যই হয় না। এদের দৃঢ় বিশ্বাস এদের প্রভু পুনর্জীবন লাভ করেছেন এবং শীগগীরই তিনি স্বর্গের থেকে সদলবলে নেমে এসে এখানে তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন। সবার মুখেই সেই একই কথা। তার থেকে বারাব্বাসের

এই ধারণাই হলো যে, এ তাদের শেখানো-বুলি মাত্র। তবে হ্যাঁ, তিনি ঈশ্বরপুত্র কিনা—এদের মধ্যেও তা নিয়ে মতদ্বৈধ রয়েছে। কেউ সে-কথায় বিশ্বাস করে, কেউ করে না। বিশ্বাস না করবার একটা মস্ত বড় কারণ, অনেকেই স্বচক্ষে তাঁকে দেখেছে, তাঁর সঙ্গে কথাও কয়েছে। ঈশ্বরপুত্রকে কি দেখা যায়? না-কি তাঁর সঙ্গে কথা কওয়াই এত সহজ? আর শুধু তা-ই নয়, একজন কারিগর বলল যে, সে তাঁকে একজোড়া জুতোও তৈরি করে দিয়েছিল। তার জন্যে তাঁর পায়ের মাপ নিতে গিয়ে সে তাঁকে স্পর্শও করেছে। যে-লোককে দেখা যায়, ছোঁয়া যায়,—মন তাঁকে আর যাই হোক ঈশ্বরপুত্র বলে মানতে চায় না। অনেকেই তাই মানে না। অনেকে আবার মানেও। তারা বিশ্বাস করে যে, স্বর্গের সিংহাসনে ঈশ্বরের পাশেই তিনি তাঁর আসন গ্রহণ করবেন। তার আগে এই পাপ-পৃথিবী অবশ্য ধ্বংস হয়ে যাবে।

কেমন ধরনের মানুষ এরা?

বারাব্বাসের বিশ্বাস আর তাদের বিশ্বাস যে এক নয়, বেশিদিন তা চাপা রইল না। সকলেই তারা সতর্ক হয়ে গেল। কেউ কেউ আবার আর-এক ধাপ এগিয়ে প্রায় খোলাখুলিভাবেই তাকে জানিয়ে দিল যে, তাকে আর তারা পছন্দ করতে পারছে না। বারাব্বাসের কাছে এটা নতুন-কিছু নয়; তা সত্ত্বেও তাদের এই সন্দেহে সে ঈষৎ দুঃখিত হলো। আগে আর কখনো হয়নি। অবিশ্বাস আর অবহেলা তার একরকম গা-সওয়াই হয়ে গিয়েছিল। চিরকালই সবাই তাকে এড়িয়ে এড়িয়ে গিয়েছে, তার থেকে দূরে সরে থেকেছে। সে-কি তার চেহারার জন্যে, না কি তার চোখের নীচের গভীর ওই ক্ষতচিহ্নটির জন্যে—যার কারণ পর্যন্ত কেউ জানে না? না-কি তার গর্তে-বসা ওই চোখদুটির জন্যে, ভাল করে যা কারুর ঠাহর পর্যন্ত হয় না? তা সে যে-কারণেই হোক, লোকে তাকে ভয় করে। তা সে জানেও। তবে আর-পাঁচজন তার সম্পর্কে কী-ভাবছে না-ভাবছে, তা নিয়ে সে কখনো মাথা ঘামায়নি। এসব দুঃখ সে গায়েই মাখত না।

এই প্রথম সে দুঃখবোধ করল।

যাদের আচরণে তার এই দুঃখ, তারা ওদিকে আরও সতর্ক হয়ে গিয়েছে। পরস্পরের তারা কাছাকাছিই থাকে; একই বিশ্বাসের বন্ধনে তারা এখন ঐক্যবদ্ধ। বাইরের কাউকে তারা বিশ্বাস করে না, কাছে ঘেঁষতে দেয় না। নিজেদের মধ্যেই মাঝে মাঝে তারা ভোজসভার আয়োজন করে; সবাই মিলে বড় একখানি রুটি ভেঙে নিয়ে তারপর খেতে বসে। কে বলবে এরা একই পরিবারের লোক নয়। আর এই একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করবার ব্যবস্থাটাও বোধ হয় তাদের ধর্মবিশ্বাসের, তাদের সেই 'পরস্পরকে ভালবাসার'ই একটি অপরিহার্য অঙ্গ। 'পরস্পরকে ভালবাসো'। বাইরের কাউকে কি এরা ভালবাসে? বলা বড় শক্ত।

তার মানে এই নয় যে, বারাব্বাসও এই একত্র-ভোজের অনুষ্ঠানে গিয়ে বসতে চায়। না, তা সে চায় না। যে-কোনো বন্ধনেই হোক না কেন, কারুর সঙ্গেই সে একসূত্রে বাঁধা পড়তে রাজী নয়। সে যা সে তা-ই; নিজের এই স্বাতন্ত্র্যকেই সে ভালবাসে।

অথচ আশ্চর্য এই যে, তা সত্ত্বেও সে আবার তাদেরই সঙ্গে গিয়ে মেলামেশা করতে শুরু করল।

এমন কি, এমন একটা ভান করতেও তার দ্বিধা হলো না যে, তাদেরই সঙ্গে সে যোগদান করতে চায়। নেহাৎ কিনা তাদের ধর্মবিশ্বাসকে সে এখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি, তাই; তা নইলে সে অনেক আগেই যোগ দিত। শুনে তারা আনন্দ জানিয়ে বলল, যে-আদর্শ তাদের প্রভু প্রচার করে গিয়েছেন বারাব্বাস যাতে তা ঠিকমতো বুঝতে পারে তার জন্যে তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। বলল বটে, কিন্তু খুশী যে তারা হয়নি, বারাব্বাসের তা বুঝতে বাকি রইল না। ব্যাপারটা এরপর অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়াল। নতুন কাউকে দলে পেলে তাদের খুশী হবারই কথা। অথচ বারাব্বাসের ক্ষেত্রে তারা খুশী হতে পারছে না। এই না-পারার দুঃখে তারা নিজেরা যতখানি ম্রিয়মান বোধ করল, তাদের উপেক্ষায় বারাব্বাসও ঠিক ততখানিই। কেন তারা তাকে বিশ্বাস করছে না? কী এর কারণ? কারণটা বারাব্বাস জানে। লজ্জায় উঠে দাঁড়িয়ে তৎক্ষণাৎ সে চলে

এল। ক্ষোভে দুঃখে তার চোখের নীচের সেই ক্ষতচিহ্নটি তখনও লাল হয়ে উঠেছে।

বিশ্বাস করবে! নিজের চোখে সে যাঁকে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মরতে দেখেছে, কেমন করে সে তাঁর ঐশ্বরিক ক্ষমতায় বিশ্বাস স্থাপন করবে! তিনি যে পুনর্জীবন লাভ করেননি, করতে পারেন না, সে-বিষয়েও বারাব্বাস দৃঢ়নিশ্চিত। সবকিছুই একটা মনগড়া ব্যাপার; একটা কল্পনা-বিলাস ছাড়া আর অন্য কিছুই নয়। এদের প্রভু বলেই কোনো কথা নেই, কারুর পক্ষেই কখনো পুনর্জীবনলাভ সম্ভব নয়। বারাব্বাসকে যে তারা মুক্তিদান করেছে, তাঁর তাতে কোনো হাত ছিল না। যে-কাউকেই তারা ছেড়ে দিতে পারত। তাকেই যে দিয়েছে এ তার সৌভাগ্য। ঈশ্বরপুত্র! অসম্ভব। আর যদি ধরেও নেওয়া যায় যে তা-ই তিনি ছিলেন, তবে তো বলতে হয় যে স্বেচ্ছাতেই তিনি প্রাণ দিয়েছেন। স্বেচ্ছাতেই প্রাণ দিয়েছেন! এ-কী ভয়ঙ্কর ইচ্ছে! এ-কী ভয়ঙ্কর অবসাদ এ-ইচ্ছের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে! অবসাদ, এ-এক বীভৎস অবসাদ। তাঁর কি তাহলে যন্ত্রণাভোগেরই বাসনা হয়েছিল? তিনি তো ঈশ্বরপুত্র। তাই যদি হয় তো এই যন্ত্রণাকেও তো তিনি অনায়াসেই এড়িয়ে যেতে পারতেন। এড়াতে তিনি চাননি। তীব্রতম যন্ত্রণার মধ্য দিয়েই তিনি মৃত্যুবরণ করতে চেয়েছিলেন। সে-ইচ্ছে তাঁর পূর্ণ হয়েছে; নিজের প্রাণের বিনিময়ে বারাব্বাসের জন্যে তিনি মুক্তি এনে দিয়েছেন। নিরুচ্চার কণ্ঠে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, "একে তোমরা মুক্তি দাও, পরিবর্তে আমাকেই তোমরা ক্রুশবিদ্ধ করো।" কিন্তু না, আর যাই হোন, ঈশ্বরপুত্র তিনি নন। হওয়া অসম্ভব…।

এ-এক আশ্চর্য উপায়ে তিনি তাঁর অলৌকিক ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়েছেন। অপ্রয়োগের মধ্য দিয়ে তিনি তার প্রয়োগ করেছেন। দৃশ্যত মনে হয়, তার এতে কোন হাত ছিল না। ছিল না কি? অদৃশ্যত ছিল। অন্যের সিদ্ধান্তে তিনি হস্তক্ষেপ করেননি, সে-সিদ্ধান্তের পরিবর্তন ঘটাবারও প্রয়াস পাননি। সবই সত্যি। কিন্তু বারাব্বাসকে মুক্তি দিয়ে তার পরিবর্তে এই যে তাঁকে হত্যা করা হলো, তাঁরই ইচ্ছে যে এর মধ্যে নিহিত নয় কে তা বলবে।

এরা বলছে এজন্যেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। সত্যি হলেও সেটা গৌণ। মুখ্যত বারাব্বাসের জন্যেই তিনি প্রাণ দিয়েছেন। এরা তাঁর নিকট-সঙ্গী, বারাব্বাস নিকটতর। সম্পূর্ণ পৃথক এক বন্ধনে সে তাঁর সঙ্গে বাঁধা পড়ে গিয়েছে। এরা অবশ্য তাকে পরিহার করতে চায়। তা করুক, তাতে তার কিছুই যায় আসে না। কেননা, যন্ত্রণার থেকে, মৃত্যুর থেকে, মুক্তিদানের ব্যাপারে তাকেই তিনি বেছে নিয়েছিলেন। সে-ই তাঁর নির্বাচিত পুরুষ। সে-ই তো সেই ভাগ্যবান। স্বয়ং ঈশ্বরপুত্রের নির্দেশে, তাঁরই প্রাণের মূল্যে সে মুক্তিলাভ করেছে। এ-ই তিনি চেয়েছিলেন। এরা তা জানে না।

বারাব্বাস কি এদের এই 'ভ্রাতৃত্ব' আর এই 'ভোজ-অনুষ্ঠান' আর এই 'পরস্পরকে ভালবাসার' তোয়াক্কা করে? কিছুমাত্র না। সে যা, সে তা-ই। নিজের এই স্বাতন্ত্র্যকেই সে ভালবাসে। ঈশ্বরপুত্রের কাছেও সে তার এই স্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জন দেয়নি, এদের মতো সে বিকিয়ে দেয়নি নিজেকে। সে অতো দীর্ঘনিঃশ্বাসও ফেলে না, অতো প্রার্থনাও জানায় না।

স্বেচ্ছায় কেউ মৃত্যুবরণ করে! অযথা কেউ যন্ত্রণা ভোগ করতে চায়! ভাবতেও তার বিশ্রী লাগল। মনশ্চক্ষুতে সেই দুর্বল মানুষটির ছবি ভেসে উঠল। হাত দুখানি শীর্ণ, অসহায়ভাবে দুদিকে ঝুলে পড়েছে। যন্ত্রণায় কণ্ঠরুদ্ধ। শুধু একটু জল চাওয়া ছাড়া অন্য আর কোনো কথাই তিনি বলতে পারেননি। আর এই যন্ত্রণা তিনি নাকি নিজের ইচ্ছেতেই বরণ করে নিয়েছেন। ইচ্ছে! এ কী বীভৎস ইচ্ছে! বারাব্বাসের এসব ভাল লাগে না, লাগেনি। এরা কিন্তু তাঁকে শ্রদ্ধা করে। শুধু যে তাঁকেই করে তা নয়; তাঁর সেই অকথ্য যন্ত্রণা, তাঁর সেই ভয়াবহ মৃত্যু—সবকিছুই এদের কাছে একটা শ্রদ্ধার ব্যাপার। মৃত্যুকেও এরা ভালবাসে। বীভৎস, বীভৎস! সারাটা মন যেন তার বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল। এদের সঙ্গে আর তার কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই,—রাখবে না। এদের সঙ্গে না, এদের প্রভুর সঙ্গেও না। সবকিছুই তার এখন বিস্বাদ লাগছে।

না, মৃত্যুকে সে ভালবাসে না। মৃত্যুকে সে ঘৃণা করে। অনন্তকাল সে

বাঁচতে চায়। আর এই প্রবল জীবনতৃষ্ণার জন্যেই বোধ হয় তার মৃত্যু হয়নি। কত লোকই তো ছিল; বেছে বেছে ঠিক তাকেই বা কেন ছেড়ে দেওয়া হলো? ধরা যাক তিনি ঈশ্বরেরই পুত্র। তা হলে তো বলতে হয়, সবই তিনি জানতেন। বারাব্বাস যে মরতে চায় না, যন্ত্রণাভোগেরও যে তার কিছুমাত্র ইচ্ছে নেই, তাও জানতেন। জানতেন বলেই বারাব্বাসের জায়গায় তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। আর তার পরিবর্তে এইটুকুই শুধু তিনি চেয়েছিলেন যে, বারাব্বাস তাঁর সঙ্গে গল্‌গথার পাহাড় পর্যন্ত যাবে, সেখানে গিয়ে স্বচক্ষে তাঁর মৃত্যুযন্ত্রণা প্রত্যক্ষ করবে। তাকে দিয়ে তিনি তাঁর সেই অদ্ভুত ইচ্ছা পূর্ণ করিয়ে নিয়েছেন। শুধুমাত্র মৃত্যুর প্রতিই নয়, মৃত্যু-যন্ত্রণা দেখতেও তার অসীম বিতৃষ্ণা। তা সত্ত্বেও সে গলগথার পাহাড়ে গিয়েছে; গিয়ে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করতে দেখেছে।

তারই জন্যে যে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন, তাতে আর তার সন্দেহ নেই। তার সম্পর্কেই তিনি তাঁর নিজচার নির্দেশ জানিয়েছিলেন, "একে তোমরা মুক্তি দাও, পরিবর্তে আমাকেই তোমরা ক্রুশবিদ্ধ করো।"

কুমোর-গলি থেকে বেরিয়ে এসে তারপর এই সবই চিন্তা করছিল সে। এদের সঙ্গে সে যোগদান করতে চেয়েছিল, এরা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

বারাব্বাস প্রতিজ্ঞা করল, কোনোদিনই আর সে আসবে না এখানে।

সে প্রতিজ্ঞা রইল না। পরের দিনই সে এল আবার। এসে স্পষ্টই বুঝতে পারল, নিজেদের আচরণে এরা এখন লজ্জা বোধ করছে। বারাব্বাসকে, যে তারা ফিরিয়ে দিয়েছিল, তার জন্যে তারা দুঃখ প্রকাশ করল। তারপর বলল, তাদের ধর্ম-বিশ্বাসের কোনখানটা বারাব্বাসের বোধগম্য হচ্ছে না তা যদি সে খুলে বলে তাহলে তারা তা তাকে যথাসাধ্য বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করবে।

বারাব্বাস বলতে যাচ্ছিল যে, সমস্ত ব্যাপারটাই তার কাছে একটা হেঁয়ালির মতো লাগছে। তা অবশ্য বলল না। বলল যে, পুনর্জীবনে সে বিশ্বাস করে না। মরা মানুষ কি কখনো বেঁচে উঠতে পারে? তার এই কথা শুনে তারা একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ; নিজেদের মধ্যে কী যেন বলাবলি করল। তারপর যিনি সব চাইতে বুড়ো, বারাব্বাসকে তিনি বললেন যে, সত্যিই তাঁদের

প্রভু মৃতকেও জীবনদান করেছেন। মৃত্যুর পর আবার বেঁচে উঠেছে এমন কাউকে কি বারাব্বাস দেখতে চায়? যদি চান তো তাঁরা দেখাতে পারেন। তবে হ্যাঁ, সন্ধ্যার আগে তা সম্ভব হবে না। তার কারণ, সে-লোকটির বাড়ি একটু দূরে। বারাব্বাস যদি তাকে দেখতে চায় তো কাজকর্ম চুকিয়ে তারপর সন্ধ্যা নাগাদ তাঁরা সেখানে তাকে নিয়ে যাবেন।

বারাব্বাস একটু হকচকিয়ে গেল। এতখানি সে ঠিক আশা করেনি। সে ভেবেছিল, বড়জোর এঁরা তর্ক করবেন, যুক্তি দেখাবেন। যুক্তিতর্কের পথে না গিয়ে সরাসরি যে এঁরা দৃষ্টান্ত প্রমাণ দাখিল করে বসবেন তা সে ভাবতেও পারেনি। এ যে একটা মনগড়া ব্যাপার, মস্ত বড় একটা বুজরুকি, যাকে এরা পুনর্জীবিত বলছে সে যে আসলে মরেইনি, তাতে অবশ্য তার সন্দেহ নেই। তা সত্ত্বেও সে ভয় পেয়ে গেল। লোকটির সঙ্গে সে দেখা করতে চায় না, দেখা করতে সে বিন্দুমাত্রও উৎসুক নয়। কিন্তু এতখানিই সে এগিয়ে এসেছে যে এখন আর তা বলা যায় না। এদের প্রভু যে কত শক্তিশালী তা উপলব্ধি করবার জন্যেই বারাব্বাসকে তারা এই সুযোগ এনে দিয়েছে। তার জন্যে, ভান করে হলেও, তার কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত।

সারাটা দিন তার এক গভীর উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে কাটল। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়ে তারপর সে যখন কুমোর-গলিতে ফিরে এল আবার, তখন প্রায় সন্ধ্যা; কাজকর্ম চুকিয়ে তারা তখন দোকানপাট বন্ধ করছে। সেখান থেকে রওনা হয়ে, শহরের ফটকগুলি একে একে পার হয়ে তারা মাউণ্ট অব অলিভের দিকে এগোতে লাগল! সে, আর অল্পবয়সী একটি ছেলে। এই ছেলেটিই তাকে পুনর্জীবনপ্রাপ্ত সেই লোকটির কাছে নিয়ে যাবে।

পাহাড়ের গায়ে ছোট্ট একটি গ্রাম; আর তার উপকণ্ঠেই সেই লোকটির বাড়ি। ঘরের বাইরে চিক টাঙানো। বারাব্বাসের সঙ্গী সেই চিকটিকে সরিয়ে দিতেই লোকটিকে দেখা গেল। ঘরের মধ্যেই তিনি বসে আছেন। হাত দুটি টেবিলের উপর প্রসারিত; দু চোখে এক আশ্চর্য শূন্যতা। তারা যে এসে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েছে, এ যেন তিনি টেরই পাননি। বারাব্বাসের সঙ্গী তাঁকে উদ্দেশ্য

জানাতে তবেই তাঁর হুঁশ হলো। ধীরে ধীরে তিনি মাথা তুলে চাইলেন। তারপর এক অদ্ভুত নিস্তরঙ্গ গলায় বসতে বললেন তাদের। বারাব্বাস লক্ষ্য করল যে, তাঁর কণ্ঠস্বরের মধ্যে বিন্দুমাত্রও ওঠা-নামা নেই। সঙ্গী ছেলেটি তাঁকে জানাল, তারা জেরুসালেমের কুমোর-গলি থেকে এসেছে। কী জন্যে এসেছে, তাও জানাল।

বারাব্বাস তাঁর ঠিক সামনাসামনি বসেছে। লোকটির শুধু কণ্ঠস্বরই নয়, চেহারাও অদ্ভুত। বিবর্ণ অস্থিকঠিন মুখ; গায়ের চামড়া ফ্যাকাসে, কুঞ্চিত। এমন রিক্ত নিষ্প্রাণ চেহারা সে আর দেখিনি। মুখ তো নয়, যেন মরুভূমি। মরুভূমির মতোই সর্বরিক্ত একটি কাঠিন্য সেখানে ফুটে উঠেছে।

সঙ্গী ছেলেটির প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানালেন, সত্যিই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। চারদিন চার রাত্রি তিনি কবরের মধ্যে ছিলেন; তারপর তাঁদের প্রভুই তাঁকে আবার বাঁচিয়ে তুলেছেন। পুনর্জীবন লাভের পর তাঁর দৈহিক আর মানসিক শক্তিও তিনি ফিরে পেয়েছেন। এতটুকুও তার তারতম্য হয়নি। তাঁকে বাঁচিয়ে তুলে প্রভু তাঁর ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন, প্রমাণ করেছেন যে তিনি ঈশ্বরপুত্র। বিবর্ণ নিষ্প্রাণ চোখে বারাব্বাসের দিকে তাকিয়ে থেকে তিনি তাঁর কথা শেষ করলেন।

তারপরেও কথা হলো কিছুক্ষণ। তাঁদের প্রভু আর তাঁর ঐশ্বরিক ক্ষমতার সম্পর্কেই তাঁরা কথাবার্তা বললেন। বারাব্বাস তাঁদের এই আলোচনায় যোগ দেয়নি; সে শুধু সব শুনে যাচ্ছিল। সঙ্গী ছেলেটি এক সময় উঠে দাঁড়াল। তাদের কাছে বিদায় নিয়ে বলল যে, সে এবারে তার বাবা আর মার সঙ্গে দেখা করতে যাবে; এই গ্রামেই তাঁরা থাকেন।

বারাব্বাসের ইচ্ছে ছিল না, সে এখানে একলা পড়ে থাকে। অদ্ভুত এই লোকটির সামনে তাকে এখন একা-একা বসে থাকতে হবে। ভাবতেই তার ভয় হলো। কিন্তু বিদায়ই বা নেয় কীভাবে। চট্ করে কোনো অজুহাতও তার মাথায় এল না। একদৃষ্টে লোকটি তার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন, সে দৃষ্টি নিষ্প্রভ, বিবর্ণ। সে চোখে কোনো ভাষা নেই। বারাব্বাসের কেমন অস্বস্তি লাগতে

লাগল। নির্বাক ওই চোখ দুটি তাকে টানছে। তাকে টানছে। সে এখন পালাতে পারলেই বাঁচে। তাও সে পারছে না।

চুপচাপ কাটল কিছুক্ষণ; কারুর মুখেই কোনো কথা নেই। তারপর এক সময় তিনি শুধোলেন:

—আমাদের প্রভুকে কি তুমি বিশ্বাস করো না? বিশ্বাস করো না তিনি ঈশ্বরেরই পুত্র?

একটু ইতস্তত করল বারাব্বাস; তারপর বলল:

—না।

এ ছাড়া আর কীই বা সে বলতে পারত। মিথ্যাও যদি বলত তো নির্বাক ওই দৃষ্টির কি তাতে কিছুমাত্রও পরিবর্তন হতো? কিছুমাত্র না। তা সে জানে। জানে বলেই সে সত্যি কথাটা বলল। না, তাদের প্রভু যে ঈশ্বরপুত্র তা সে বিশ্বাস করে না।

লোকটি তাতে ক্ষুণ্ণ হলেন না। অল্প একটু মাথা দুলিয়ে বললেন:

—শুধু তুমি নও, অনেকেই বিশ্বাস করেন না। কাল আমার মা এখানে এসেছিলেন; তিনিও করেন না। অথচ তা সত্য! তিনি যে আমাকে পুনর্জীবন দান করেছেন তাও সত্য। তাঁরই ক্ষমতার আমি সাক্ষ্যবহন করছি।

বারাব্বাস বলল, সেইজন্যেই এত সহজে তিনি তাঁর প্রভুর ঐশ্বরিক ক্ষমতায় বিশ্বাসী হতে পেরেছেন। তিনি যে পুনর্জীবন লাভ করেছেন, এ-জন্যে তাঁর চিরকৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

তিনি বললেন, কৃতজ্ঞতার তাঁর সীমা নেই। প্রভু তাঁকে নবজীবন দান করেছেন, মৃত্যুপুরী থেকে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন। এজন্যে তিনি রোজই তাঁর উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে থাকেন।

মৃত্যুপুরী! বারাব্বাস যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল। তাঁর কণ্ঠস্বর ঈষৎ কাঁপতে লাগল।—মৃত্যুপুরী!···সে-জায়গা কেমন? আপনি সেখানে ছিলেন? কেমন জায়গা সেটা?

—কেমন জায়গা? বারাব্বাসের প্রশ্নেরই তিনি পুনরাবৃত্তি করলেন। তার জিজ্ঞাস্যটা যেন তিনি ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি।

—হ্যাঁ, কেমন? কেমন জায়গা? কিছুই কি তার আপনি বুঝতে পারেননি? বুঝতে হয়নি?

বারাব্বাসের এই উৎকণ্ঠ অস্থিরতাকে তিনি একটিমাত্র কথায় নিভিয়ে দিলেন। বললেন:

—না, কিছুই আমাকে বুঝতে হয়নি। আমি মারা গিয়েছিলাম মাত্র এবং যে মারা যায় সে জানে যে, মৃত্যু আসলে কিছুই না।

—কিছুই না?

—না।

বারাব্বাস তাঁর দিকে তাকিয়েই রইল। অদ্ভুত এক বিস্ময়ে দুই চক্ষু তার বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে।

মৃত্যুপুরী বলতে কী বোঝায়, তুমি জানতে চাও। কিছুই বোঝায় না। সে-জায়গা আছে, কিন্তু নেইও।

বারাব্বাস তবু তাকিয়ে রইল। নিষ্প্রাণ কঠিন ওই চোখ দুটি তাকে টানছে তাকে টানছে। নিজের দৃষ্টিকে যে সে ফিরিয়ে নেবে অন্যদিকে, তেমন শক্তিও যেন আর তার অবশিষ্ট নেই।

—সে-জায়গা আছে কিন্তু নেইও। আসলে তা কিছুই নয়। কিন্তু একবার যারা সেখানে গিয়েছে তারা জানে যে, কিছু না-হয়েও তা সব-কিছু এবং অন্য আর কোনো কিছুই তখন কিছু নয়।

একটুক্ষণ তিনি চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন:

—তুমি বড় অদ্ভুত প্রশ্ন করেছ। কেন করেছ আমি জানি না। অন্য আর কেউই কখনো এ নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি। জেরুসালেমের থেকে কাউকে-না-কাউকে প্রায়ই আমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাঁদের কাছে আমি আমার অভিজ্ঞতার কথা বলি। শুনে যাঁদের প্রত্যয় হয়, আমাদের এই ধর্মবিশ্বাসে তাঁরা দীক্ষা গ্রহণ করেন। অনেকেই এইভাবে দীক্ষা নিয়েছেন। প্রভুর কাছে আমার ঋণের অন্ত

নেই। আর এখন এইভাবেই আমি তাঁর ঋণ পরিশোধ করে চলেছি। প্রায় প্রত্যেকদিনই কেউ-না-কেউ এখানে আসেন। পুনর্জীবন লাভের কথা তাঁদের আমি বলেছি, মৃত্যুপুরীর কথা নয়। কেউ তা নিয়ে কোনো প্রশ্নও করেননি আমাকে। তুমিই প্রথম করলে।

সারা ঘর অন্ধকার হয়ে এসেছে। ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে তিনি একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিলেন। তারপর খাবার বার করে আনলেন খানিকটা। একখণ্ড রুটি, আর একটু নুন। রুটিটাকে ভেঙে নিয়ে খানিকটা অংশ তিনি নিজের জন্যে রাখলেন; বাকিটা এগিয়ে দিলেন বারাব্বাসকে। নিজের অংশটুকুতে তিনি নুন মাখিয়ে নিলেন; তাঁর অনুরোধমতো বারাব্বাসও মাখাল। কী এক গভীর উত্তেজনায় তার হাত কাঁপছে।...অনুজ্জ্বল ম্লান আলো। তার থেকে বিষণ্ণ-মধুর একটি শান্তি ছড়িয়ে পড়েছে। চুপচাপ তারা খেতে বসল; কারো মুখেই কোনো কথা নেই।

কই, বারাব্বাসের সঙ্গে একত্র-আহারে তো এঁর কোনো আপত্তি হলো না। কুমোর-গলির লোকদের মতো এঁর অতো বাছ-বিচার নেই। সবাই এঁর কাছে সমান, তুল্যমূল্য। তবুও তার অস্বস্তি লাগতে লাগল। তিনি যখন তাঁর হলদে-কঠিন আঙুলে করে বারাব্বাসকে তার রুটির টুকরো এগিয়ে দিলেন, আর সেই রুটি যখন সে মুখে তুলল, বারাব্বাসের মনে হলো যেন সারা মুখ তার শবাস্বাদে ভরে উঠেছে।

সে যাই হোক, বারাব্বাসের সঙ্গে তাঁর একত্র-আহারের অর্থ কি? নিশ্চয়ই এর কোনও নিগূঢ় তাৎপর্য রয়েছে। কী সেই তাৎপর্য?

খাওয়া শেষ হলে বারাব্বাসকে তিনি দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন; প্রার্থনা জানালেন যে তার জীবন শান্তিময় হোক। তার উত্তরে অস্ফুটস্বরে কী যেন বলল বারাব্বাস, তারপর দ্রুত বেরিয়ে এল। বাইরে অন্ধকার, আর সেই অন্ধকারের মধ্যেই পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে রাস্তা নেমে গিয়েছে। কী এক চিন্তা যে তাকে পীড়ন করছে সারাক্ষণ তা সে জানে না।

মুলাকিনী সেই মেয়েটি সে রাত্রে অবাক হয়ে গেল। বারাব্বাস কেন আজ উদ্ভ্রান্ত হয়ে উঠেছে। আনন্দসম্ভোগে সম্প্রতি তার এতখানি আগ্রহ সে আর দেখেনি। মনে হলো যেন একটা অবলম্বন চায় বারাব্বাস, কিছু একটা আঁকড়ে ধরতে চায়। সে-ই তো সেই অবলম্বন, সেই আশ্রয়। শুয়ে শুয়ে মেয়েটি স্বপ্ন দেখতে লাগল। স্বপ্ন দেখল যেন সে আবার তার হৃত-যৌবন ফিরে পেয়েছে; স্বপ্ন দেখল যেন কেউ তার প্রেমে পড়েছে।

পরের দিন আর বারাব্বাস কুমোর-গলির দিকে গেল না; চুপচাপ সলোমন-তোরণের কাছে গিয়ে বসে রইল। কিন্তু কুমোর-গলিরই কে যেন ওখান দিয়ে আসছিল। বারাব্বাসকে দেখে সে এসে জিজ্ঞেস করল, এবারে তার সন্দেহভঞ্জন হয়েছে তো? মরা মানুষকেও যে বাঁচিয়ে তোলা যায়, তা নিয়ে আর তার কোনো সন্দেহ নেই নিশ্চয়ই? বারাব্বাস বলল, লোকটি যে মারা গিয়েছিলেন আর তাঁদের প্রভুই যে তাঁকে বাঁচিয়ে তুলেছেন আবার, তা সে মেনে নিচ্ছে। কিন্তু একটা কথা; পুনর্জীবনদানের শক্তি তাঁর আছে যদিও, অধিকার নেই। মরা মানুষকে বাঁচিয়ে তুলে তিনি অন্যায় করেছেন।

এ-কী অসম্মানজনক কথা! লোকটি আর কোনো কথা বলতে পারল না; সারা মুখ তার ছাইয়ের মতো শাদা হয়ে গিয়েছে। বারাব্বাসও আর কিছু বলল না। অন্যদিকে তাকিয়ে রইল সে।

কথাটা কিন্তু চাপা রইল না। কুমোর-গলিই শুধু নয়, কলু-পাড়া, চামার-গলি, তাঁতি-মহল্লা—সব জায়গাতেই ছড়িয়ে পড়ল। বারাব্বাসও তা বুঝতে পারল। দুদিন বাদেই সে ফের কুমোর-গলিতে গিয়েছিল; গিয়ে দেখল যে, কেউই আর তাকে বিশ্বাস করছে না, সবাই এখন তাকে সন্দেহের চোখে দেখছে। কেমন যেন থমথমে একটা আবহাওয়া। বারাব্বাসের সঙ্গে যে তাদের কোনো ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠেনি তা ঠিক, তবে সন্দেহটাকে এবারে তারা খোলাখুলি-ভাবেই প্রকাশ করতে শুরু করেছে। এত ঘনঘন সে এখানে আসছে কেন? কী চায় সে? তাদের সঙ্গে তার মেলামেশারই বা উদ্দেশ্য কী? সে কি কারুর

গুপ্তচর? একজন তো আবার স্পষ্টই তা জিজ্ঞেস করে বসল। লোকটি একটু খর্বাকৃতি, মাথা-জোড়া টাক। বারাব্বাস তাকে আর এর আগে কখনো দেখেনি। প্রশ্ন শুনে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। কোনো কথাই সে বলতে পারল না। শুধু দেখল যে, ক্রোধে আর উত্তেজনায় লোকটি অস্থির হয়ে উঠেছে। লোকটিকে সে চেনে না। দেখে মনে হয়, কাপড় চোপড় রঙ করাই এর পেশা।

বারাব্বাস বুঝল যে, তার কথায় এরা ক্ষুণ্ণ হয়েছে, এদের ধর্মবিশ্বাসে তাতে আঘাত লেগেছে। বুঝল যে এরা আর তার প্রতি বিন্দুমাত্রও প্রসন্ন নয়। কেউই আর তার সঙ্গে মেশে না, কথা কয় না। সকলেই তাকে এখন সন্দেহ করতে শুরু করেছে। কে সে, তারা জানতে চায়।

এবং যা অনিবার্য তা-ই একদিন ঘটল শেষ পর্যন্ত। কথাটা প্রায় দাবাগ্নির মতো ছড়িয়ে পড়ল। স্তম্ভিত হয়ে সবাই শুনল যে, এ-ই সেই লোক! এরই পরিবর্তে তাদের প্রভুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে, এরই জায়গায় ঈশ্বরপুত্র প্রাণ দিয়েছেন। বারাব্বাস। এ-ই সেই বারাব্বাস।

ঘৃণা আর বিদ্বেষ যেন তাকে তাড়িয়ে ফিরতে লাগল। ক্রোধে আর ক্ষোভে তারা তখন উন্মত্তপ্রায়। বারাব্বাস ততক্ষণে আত্মগোপন করছে; সে আর এখানে ফিরে আসবে না। কোনো দিনই না। তবুও তাদের শান্তি নেই।

—বারাব্বাস! এ-ই সেই বারাব্বাস!

সেই যে বারাব্বাস বাড়িতে এসে ঢুকেছে, বড় একটা আর বেরোয়নি তারপর। ঘরের একপাশে একটি পর্দা টাঙানো; চুপচাপ তার পিছনে সে শুয়ে থাকে, আর কী-যেন ভাবে। কারুর সঙ্গেই সে আর এখন কথা কয় না, স্থূলাঙ্গিনী সেই মেয়েটির সঙ্গেও না। বাড়িতে খুব যদি হৈ-হল্লা হয় তো চুপচাপ সে ছাতের উপরকার সেই ঘরটিতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। গোলমাল থামলে তারপর নীচে নেমে আসে। দিনের পর দিন এইভাবে কাটতে লাগল; বারাব্বাসের কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না। আহারে পর্যন্ত তার মন নেই। সামনে যদি কেউ খাবার এগিয়ে দেয় তো খায়, তা নইলে সে খায় না পর্যন্ত। কোনো কিছুর সম্পর্কেই আর তার কোনো আগ্রহ নেই; সবকিছুর সম্পর্কেই সে নির্লিপ্ত, বীতস্পৃহ।

কী যে হয়েছে তার, অনেক ভেবেও মেয়েটি তার কোনো হদিশ পেল না। অথচ বারাব্বাসকে এ নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করবার মতো সাহস তার নেই। এইটুকু শুধু সে বুঝতে পেরেছে যে, বারাব্বাস এখন একলা থাকতে চায়। তা-ই থাক। কোনো কথারই সে জবাব দেয় না আজকাল, চুপচাপ শুধু ছাতের দিকে তাকিয়ে থাকে। আর কী যেন ভাবে। কী যে ভাবে, মেয়েটি জানে না। বারাব্বাসের কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? ও কি পাগল হয়ে যাচ্ছে?—গিয়েছে? মেয়েটি জানে না।

হঠাৎ তার একটা সন্দেহের উদয় হলো। বারাব্বাসের জায়গায় যাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে, বারাব্বাস তার শিষ্যদের সঙ্গে খুব মেলামেশা করছে ইদানীং। মেয়েটির তা কানে গিয়েছিল। তারাই কোনো মন্ত্র দেয় নি তো? তা-ই হবে বোধ হয়। তাদের সঙ্গে এই মেলামেশার পর থেকেই বারাব্বাসের একটা স্পষ্ট ভাবান্তর দেখা দিয়েছে। তারপর থেকেই সে গুম মেরে গিয়েছে। এ নিশ্চয়ই তাদেরই কাজ। নিজেরা তারা উন্মাদ; বারাব্বাসকেও তারা উন্মাদ

বানিয়ে ছাড়বে। উন্মাদ, তা ছাড়া আর কী। ক্রুশবিদ্ধ সেই লোকটি[illegible] তারা তাদের ত্রাণকর্তা বলে মনে করে ; মনে করে যে, তিনিই একদিন [illegible]র দুঃখ দূর করবেন। শুধু কি তাই ? সেই ত্রাণকর্তাই নাকি একদিন এই জেরুসালেমের সিংহাসনে এসে বসবেন! পাগল, এরা সব বদ্ধ পাগল! আর তার বারাব্বাস কি না শেষকালে এই পাগলদের সঙ্গে গিয়ে মেলামেশা করতে শুরু করল। ছী-ছি তার একটু লজ্জাও করল না? বারাব্বাসকেই ক্রুশবিদ্ধ করবার কথা ছিল। তা না করে সে-জায়গায় তাদের ত্রাণকর্তাকে করা হয়েছে। কেন এমনটা হলো, কী এর হেতু, বারাব্বাসের যে এতে হাত ছিল না, তাদের কাছে তা তাকে বুঝিয়ে বলতে হয়েছে নিশ্চয়ই। আর তখন তাকে কায়দায় পেয়ে তারাও নিশ্চয়ই তাকে খুব খানিকটা মন্ত্র দিয়ে দিয়েছে। তাকে বুঝিয়েছে যে, তাদের প্রভু নির্দোষ, পবিত্র। বুঝিয়েছে যে, তিনি একজন মহাপুরুষ। তা সত্ত্বেও কি না তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হলো! বারাব্বাসও তাই হয়তো মরমে মরে আছে। এমন একজন মহামানবের প্রাণের বিনিময়ে বেঁচে থাকবার লজ্জাতেই সে হয়তো আর কথা কইতে পারছে না। ভাবছে যে, এর চাইতে সে নিজে মরলেই ভাল ছিল। নাঃ, এই যে হয়েছে, তাতে আর সন্দেহ নেই।

না-মরার লজ্জাতেই সে এখন জীবন্মৃত! বোকা, বারাব্বাস একটা বোকা! আপনমনেই মেয়েটি হেসে উঠল। এ কী পাগলামি ওর মাথায় ঢুকেছে!

কিন্তু না, চুপ করে থাকাটা আর কোনো মতেই ঠিক নয়। বারাব্বাসের সঙ্গে এ নিয়ে সে খোলাখুলি কথা কইবে। তাকে সব বুঝিয়ে বলবে।

বলা হলো না। সঙ্কল্প ভেসে গেল। কী এক দুর্জ্ঞেয় কারণে বারাব্বাসের সঙ্গে কেউ কখনো তার ব্যক্তিগত কোনো ব্যাপার নিয়ে কথা বলবার সাহস পায় নি। মেয়েটিও পেল না।

এবং তাই আগেরই মতো দিন কাটতে লাগল। দুর্ভাবনার অবসান হলো না মেয়েটির ; উল্টে আরো আকাশ-পাতাল সাতশো রকমের চিন্তায় সে নিজেই প্রায় পাগল হয়ে উঠল। বারাব্বাসের কি অসুখ হয়েছে ?—কঠিন কোনো অসুখ ? তা-ই হবে বোধ হয়। অসম্ভব রোগা হয়ে গিয়েছে সে ; মুখখানি বিবর্ণ,

ক্যাকাশে। ইলাস্রাহ একদিন ওর চোখের নীচে ছোরা বসিয়ে দিয়েছিল। একমাত্র সেই ক্ষতচিহ্নটি ছাড়া রক্তের আর কোনো আভাষ পর্যন্ত কোনোখানে নেই! এই কি সেই দুর্দান্ত মানুষ? বিশ্বাস হতে চায় না। দেখলে এখন দুঃখ হয়। কারুর সঙ্গেই সে আর কথা কয় না, চুপচাপ শুয়ে থাকে। আর কী যেন ভাবে! বারাব্বাস! বারাব্বাসের মতো লোকের কি না শেষে এই দশা হলো!

ওর উপরে কারুর ভর হয় নি তো? তাই যদি হয়? এমন যদি হয় যে অন্য কারুর আত্মা ওর শরীরে এসে বাসা বেঁধেছে, যা-খুশি ওকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে? দেখে তো অন্তত তাই মনে হয়। কিন্তু সে-আত্মা কার? ক্রুশবিদ্ধ হয়ে যে মারা গিয়েছে তারই নয় তো? তা-ই হবে। বারাব্বাসের সে অনিষ্ট করতে চায়। মৃত্যুর মুহূর্তে তার আত্মা তাই বারাব্বাসের উপরে এসে ভর করেছে। নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও হত্যা করা হয়েছে তাকে; আর এদিকে দোষী হওয়া সত্ত্বেও বারাব্বাসকে তার জায়গায় মুক্তিদান করা হয়েছে। বারাব্বাসের উপরে তাই সে প্রতিশোধ নিতে চায় হয়তো। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই। তা-ই যদি না হবে তো ছাড়া পাবার ঠিক পর থেকেই বারাব্বাসের এই পরিবর্তন ঘটল কেন? প্রথম দিনেই তার এই পরিবর্তন মেয়েটির চোখে পড়েছিল; দিনদিনই তার মাত্রাটা আরও বেড়ে চলেছে। নাঃ, আর কোনো সন্দেহ নেই তার। একটা জায়গায় শুধু একটু গোলমাল ঠেকছে। লোকটাকে তো গল্‌গথার পাহাড়ে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল, আর বারাব্বাস তো সেখানে যায়ও নি। তা হলে? বারাব্বাসের শরীরের মধ্যে সে যে তার আত্মাকে চালান করে দিয়েছে,—কখন দিল? কেমন করেই বা দিল? মেয়েটি একটু অবাক হয়েছিল প্রথমটায়। তারপর দেখল যে, এতে অবাক হবার কিছু নেই। লোকটার নাকি অসাধারণ সব ক্ষমতা ছিল। তাই যদি হবে তো দরকার হলে সে অদৃশ্যও হতে পারত নিশ্চয়ই; যেখানে খুশি, এবং যখন খুশি, যেতে পারত। দূরে থাকা সত্ত্বেও বারাব্বাস তাই রেহাই পায় নি।

কিন্তু বারাব্বাস কি তা জানে? জানে যে ক্রুশবিদ্ধ সেই লোকটার আত্মা শেষকালে তারই শরীরে এসে আশ্রয় নিয়েছে? মুক্তি পেলেও যে মৃত্যু ঘটেছে

বারাব্বাসের,—আর মৃত্যুর পরেও যে সেই লোকটা এখনো বেঁচে রয়েছে, বারাব্বাসেরই দেহের মধ্যে এসে বেঁচে রয়েছে, বারাব্বাস কি জানে সে-কথা? জানে?

না বোধ হয়! সে হয়তো কিছুই টের পায় নি, পায় না। পায় না বলেই অবস্থাটা আরো খারাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর-একজনের আত্মাকে সে এখন বহন করে বেড়াচ্ছে, বারাব্বাসের অনিষ্টসাধনই যার উদ্দেশ্য।

বারাব্বাসের জন্তে তার দুঃখ হলো! আহা বেচারা! তার দিকে তাকালেও এখন কান্না পায় মেয়েটির। বারাব্বাসের সেদিকে ভ্রুক্ষেপ পর্যন্ত নেই। কেমন করেই বা থাকবে। কোনোদিকেই কি আর তার মন আছে এখন? কোনোদিকেই না। মেয়েটির দিকে সে আর তাই তাকায় না পর্যন্ত। রাত্তিরেও তাকে আর তার দরকার পড়ে না। এই দুঃখটাই মর্মান্তিক। বারাব্বাস আর চায় না তাকে। তা সে বোঝেও। তবে কি না সে মূর্খ, এত অবহেলার পরেও সে তাই বারাব্বাসকেই আঁকড়ে ধরে আছে। বুক ফেটে তার কান্না পায় এক এক সময়। কিন্তু কান্নাতেও আর সেই আবেগ নেই, সেই আনন্দ নেই। কাঁদতে আর তাই ভাল লাগে না। আশ্চর্য! এ কি সে কখনো ভাবতেও পেরেছিল?

বারাব্বাসকে কি আর ফিরিয়ে পাওয়া যাবে না? কেমন করে যাবে? কেমন করে সেই ক্রুশবিদ্ধ লোকটির আত্মাকে দূর করে দিয়ে বারাব্বাসকে সে ফের সুস্থ করে তুলবে? কোনো উপায়ই তার জানা নেই। এমন একজন শক্ত সমর্থ মানুষ, সে কিনা শেষে এ-ই হয়ে গেল। নিজের আর তার কোনো ইচ্ছে অনিচ্ছে নেই; অন্যের আত্মার সে এখন বশীভূত। আর সে-আত্মা অত্যন্তই বলশালী, বারাব্বাসকে দিয়ে সে এখন যা-খুশি করিয়ে নিচ্ছে। মেয়েটি এমন কিছু ভয়কাতুরে নয়। তা সত্ত্বেও তার ভয় ভয় করতে লাগল।

না, ঠিক ভয়ও নয়। উপায়হীনতার একটা তীব্র অস্বস্তিই তাকে এখন অস্থির করে তুলেছে। মেয়েটি স্বাস্থ্যবতী, পৃথুলা। বারাব্বাসই তার উপযুক্ত পুরুষ। আগে অন্তত ছিল। তখন সে ছিল স্বাভাবিক মানুষ; উদ্ভট এইসব

চিন্তা তখনো তার মাথায় ঢোকে নি। কী ভাবছে বারাব্বাস? ভাবছে তারই আসলে ক্রুশবিদ্ধ হওয়া উচিত ছিল। তা যে হয় নি, মেয়েটি সুখী। এ ছাড়া তার আর অন্য কোনো সান্ত্বনা নেই।

একা একা মেয়েটি তাই ভাবছিল। ভাবতে ভাবতেই সে এক সময় যে, সব কিছুই আসলে তার কল্পনামাত্র। সত্যি-মিথ্যে কিছুই সে জানে কী-যে হয়েছে বারাব্বাসের, আদৌ তার উপরে কারুর ভর হয়েছে কি না,—জ না। তবে হ্যাঁ, তার দিকে আর বারাব্বাসের এখন কিছুমাত্র নজর নেই। অথচ বারাব্বাসকেই ভালবাসে। তার এই উপেক্ষা সত্ত্বেও ভালবাসে। এ তার দুর্ভা ছাড়া আর কী। দু-চোখ তার অশ্রুতে ভরে উঠল। মনে হতে লাগল যে তা মতো অসুখী আর কেউ নেই।

ইতিমধ্যে দিন দুয়েক বারাব্বাস শহরে বেরিয়েছিল। ঘুরতে ঘুরতেই একদিন একটা বাড়িতে এসে হাজির হলো। আসলে সেটা বাড়ি নয়, নিচুম একটা গুদামঘর মাত্র! চেহারা দেখে অন্তত তাই মনে হয়। দেয়ালের গা এখানে-ওখানে দু-চারটে ঘুলঘুলি, তা দিয়ে অল্প-একটু আলো আসে। বা ঘর অন্ধকার। আর তার দম-আটকা বাতাসের সঙ্গে কাঁচা চামড়ার উ একটা গন্ধ মেশানো। তাতে করে মনে হয়, এটা চামড়ার গুদাম। অথচ চামড়া-গলিও নয়। জায়গাটা হলো কেড্রন উপত্যকার দিকে, তার ঠিক পাশে একটা পাহাড়। এখানে আবার চামড়ার গুদাম ছিল কবে। বারাব্বাস এক অবাক হলো। তারপরেই সে বুঝল যে, পাহাড়ের উপরকার মন্দিরে যে-সম পশুবলি দেওয়া হয়, তারই চামড়া আগে এখানে শুকিয়ে নেওয়া হতো। এখ আর হয় না। জায়গাটা এখন অব্যবহার্য হয়ে পড়ে রয়েছে। দেয়াল ঘেঁ সারি সারি কতগুলি গামলা বসানো। গামলাগুলি শূন্য; তা সত্ত্বেও তা ভিতর থেকে উৎকট একটা গন্ধ বেরোচ্ছে। মেঝের উপরে একরাশ জঞ্জাল।

বারাব্বাসকে কেউ দেখতে পায় নি। দরজার ধারে চুপচাপ এক কোণে গা ঢাকা দিয়ে বসে আছে। ঘরের মধ্যে যারা এসে জমায়েত হয়েছে তারা সব

প্রার্থনানিরত। একদৃষ্টিতে বারাব্বাস তাদের লক্ষ্য করে যাচ্ছিল। সকলকেই যে সে দেখতে পাচ্ছে তা নয়; বলতে কি ঘুলঘুলির কাছে যারা বসে আছে, একমাত্র তাদেরকেই শুধু দেখতে পাওয়া যায়;—অন্য আর কাউকেই না। তবে না-দেখেও বারাব্বাস বুঝল যে, এ-ঘরের সব জায়গাতেই, এমন কি আনাচ-কানাচের অন্ধকারেও তারা ছড়িয়ে আছে। অন্ধকারের মধ্যে থেকেও তাদের মৃদুমন্থর প্রার্থনার সুর ভেসে আসছে। কখনো কখনো কোনো একটি জায়গায় দু'চার জনের প্রার্থনা একটু উচ্চকণ্ঠ হয়ে ওঠে, তারপর খাদে নামতে নামতে আবার মিলিয়ে যায়; শ্লথগম্ভীর একটিইমাত্র গুঞ্জন জেগে থাকে। আর সেই মিলিতকণ্ঠ গুঞ্জন কখনো নিচু গ্রামের থেকে উঁচুতে, আরো উঁচুতে উঠে আসে। সারা ঘর যেন গমগম করে ওঠে তখন। মনে হয় যেন কী-এক আবেগে এরা উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, যেন আর কোনো কিছুর দিকেই এদের লক্ষ্য নেই। আর সেই উন্মত্ততার আবেগ একটু থিতিয়ে আসতে-না-আসতেই কেউ একজন উঠে দাঁড়ায়; তাদের প্রভু যে কতো মহান, কতো শক্তিশালী, নিজের অভিজ্ঞতার থেকে সে তাই বর্ণনা করতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গেই সবাই নিস্তব্ধ হয়ে যায়। নিস্তব্ধ, তবু উন্মুখ। মনে হয় যেন প্রত্যক্ষদর্শী এই লোকটির কথার থেকে তারা নতুনতর কোনো শক্তি আর উদ্যম সংগ্রহের চেষ্টা করছে। তারপর আবার প্রার্থনা। আবারো সেই মিলিত-কণ্ঠ গুঞ্জন। আর তার দ্রুতলয় কণ্ঠের আঘাতে সারা ঘর ঝঙ্কৃত, পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে; তারপর ভেসে যায়।

প্রার্থনার মধ্যে মধ্যে এতক্ষণ যারা উঠে দাঁড়িয়েছে, বারাব্বাস তাদের দেখতে পায় নি। এবারে তার কাছের একজন উঠে দাঁড়াল। লোকটি মধ্যবয়সী, ঘর্মাক্তকলেবর। গাল দুটি গর্তে-বসা; তার উপর দিয়ে ঘাম ঝরে পড়ছে। কথা শেষ করে সে মেঝের উপরে শুয়ে পড়ল, কপাল দিয়ে সেখানকার মাটি স্পর্শ করল। তাদের প্রভুই যে সবকিছু নন, তাঁরও উপরে যে একজন ঈশ্বর আছেন, হঠাৎ যেন সে-কথা তার মনে পড়েছে।

তার ঠিক পরেই দূরের থেকে আর-একজন উঠে দাঁড়াল। গলাটা মনে হলো চেনা-চেনা। মুখের উপরে আলো এসে পড়েছে। দেখবামাত্রই বারাব্বাস তাকে

চিনতে পারল। গ্যালিলির সেই লোহিতশ্মশ্রু লোকটি। অন্যান্যদের মতো তিনি উত্তেজিত নন, আপন ভাষায় ধীরে ধীরে শান্তকণ্ঠে তিনি কথা বলে যেতে লাগলেন। জেরুসালেমের বাসিন্দারা এ-ভাষা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। এরা কিন্তু করছে না। গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাঁর প্রতিটি কথা শুনে যাচ্ছে। কথাগুলির মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই,—তবু। প্রথমটায় তিনি তাঁর প্রভুর কথা বললেন। তাঁর শক্তি তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, তাঁকে যারা বিশ্বাস করে, তাঁরই জন্যে তাদেরকে নিপীড়ন এবং অত্যাচার সহ্য করতে হবে; প্রভুই সেকথা বলে গিয়েছেন। সে অত্যাচার যদি আসেই—আসবেই—শান্তচিত্তেই তাঁরা তাকে বরণ করে নেবেন; এবং সমস্ত যন্ত্রণার মধ্যেও তাঁরা মনে রাখবেন যে, তাঁদের প্রভুকেও একদিন যন্ত্রণাভোগ করতে হয়েছে। তাঁর মতো অতোখানি শক্তি অবশ্য তাঁদের নেই, তাঁরা দুর্বল, অক্ষম। তা সত্ত্বেও যন্ত্রণার সেই অগ্নিপরীক্ষার মধ্যেও তাঁরা বিশ্বাসভঙ্গ করবেন না, প্রভুকে তাঁরা অস্বীকার করবেন না। এই পর্যন্ত বলে তিনি থামলেন। বারাব্বাসের সর্বক্ষণই মনে হচ্ছিল যে, কথাগুলি যেন তিনি অন্যদের উদ্দেশ্যেই শুধু নয়, নিজের উদ্দেশ্যেও বলছেন। শ্রোতারা হয়তো আরো কিছু আশা করেছিল; দেখে বোঝা গেল, তারা হতাশ হয়েছে। তিনিও তা বুঝে থাকবেন হয়তো। একটুক্ষণ থেমে থেকে তিনি বললেন, প্রভু তাঁকে এক সময় একটি প্রার্থনা শিখিয়েছিলেন, সেটি আজ তিনি তাঁদের শোনাবেন। প্রার্থনা শুনে সবাই খুশী হলো, অনেকে দেখা গেল অভিভূত হয়ে পড়েছে। সারা ঘর প্রশংসামুখর, তারই মধ্যে কেউ কেউ তাঁকে অভিনন্দন জানাতেও এগিয়ে এল। বারাব্বাস চিনতে পারল তাঁদের। এরাই তাকে একদিন বলেছিল, "দূর হও নাস্তিক! দূর হও!"

আরো দু-একজন এর পর উঠে দাঁড়িয়ে তাঁদের প্রভু সম্পর্কে দু-চার কথা বলল। সারা ঘরে এক তীব্র আনন্দ সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল, ক্রমেই যেন তা আরো তীব্র, আরো ঘনীভূত হয়ে আসছে। আর সেই আনন্দের আবেগে উপবিষ্ট অবস্থাতেও দুলছে কেউ কেউ, সর্বাঙ্গ তাদের এক ছন্দোবদ্ধ সুষমায়

আন্দোলিত হচ্ছে। বারাব্বাসের মনে হলো, এরা মন্ত্রমুগ্ধ। চুপচাপ সে সব দেখে যেতে লাগল।

কী এক বিস্ময় যে তার জন্যে জমা রয়েছে, তা সে তখন ভাবতেও পারে নি। আচমকা সে অবাক হয়ে গেল। ঠোঁটকাটা সেই মেয়েটি। ভিড়ের মধ্যে থেকে সে উঠে দাঁড়িয়েছে। হাত দুখানি তার শীর্ণ বুকের উপরে জড়ো করা; মুখখানি বিবর্ণ। আর সেই বিবর্ণ রক্তশূন্য মুখের উপরে সূর্যের আলো এসে পড়েছে। সমাধিভূমির পাশে আকস্মিকভাবে সেই যে একদিন দেখা হয়ে গিয়েছিল, তারপর আর তাদের দেখা হয় নি। বারাব্বাসের মনে হলো, এই ক'দিনেই সে যেন আরো রোগা, আরো ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। গাল দুটি গর্তে-বসা, দৃষ্টি বিস্ফারিত। পোষাকও শতচ্ছিন্ন। সকলেই তার দিকে তাকিয়ে আছে, কেউই তাকে চেনে না। চেনে না বলেই মনে হলো। মনে হলো, তারা বিস্ময়বোধ করছে। অথচ কেন যে এই বিস্ময় তাও যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। কী বলবে এই মেয়েটি?

সত্যিই তো, কী বলবে? এ প্রশ্ন বারাব্বাসেরও। মেয়েটি যেন বিব্রত বোধ করছে; কী যে বলবে ভেবে পাচ্ছে না। কিছু বলুক আর নাই বলুক, বারাব্বাসের তাতে কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। তা সত্বেও তার অস্বস্তি লাগতে লাগল। কী বলবে ও?

স্পষ্টই বোঝা গেল, মেয়েটি একটু ভয় পেয়ে গিয়েছে। চোখ বুজে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কারুর দিকে তাকাবার পর্যন্ত তার সাহস নেই। যেন দু-চার কথা বলে এখন সে পালাতে পারলেই বাঁচে। এতই যদি ভয় তো এখানে না এলেই পারত। কী এমন ক্ষতি হতো তাতে।

ঈশ্বরপুত্রের অলৌকিক শক্তি সে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে। সেই কথাই সে আজ এখানে জানাবে। পৃথিবীর তিনি ত্রাণকর্তা। তাঁর অসীম শক্তিতে আস্থা জানিয়ে সে অস্ত প্রসঙ্গ শুরু করল। এমনিতেই মেয়েটি জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলে, তার উপরে আবার এত লোক দেখে সে আজ ভয় পেয়ে গিয়েছে। কোনো কথাই তাই সে গুছিয়ে বলতে পারল না। শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে মনে হলো,

খুবই হতাশ হয়েছে তারা। অস্বস্তি বোধ করছে। দু'একজন তো লজ্জায় মুখ নিচু করে বসে রইল। মেয়েটির শেষ ক'টি কথা বারাব্বাস শুনতে পেল—"প্রভু তোমার হয়ে তুমি আমাকে সত্যজ্ঞাপন করতে বলেছিলে; তোমার আদেশই আমি পালন করলাম।" বলে সে এক কোণে বসে পড়ল। অন্যান্যদের উৎসুক দৃষ্টির থেকে সে এখন আত্মগোপন করতে পারলেই বাঁচে।

শ্রোতারা সব পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। কিছুই প্রায় বলতে পারে নি মেয়েটি। তার এই অক্ষমতার জন্যেই যেন শান্ত-গম্ভীর এই অনুষ্ঠানের মর্যাদা ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তা-ই হবে হয়তো। এরপর যে আর অন্য কিছু জমবে না, তা-ও সবাই জানে। সকলেই এখন সভাভঙ্গ করে বাড়ি যেতে চায়। বারাব্বাসকে যারা নাস্তিক বলে তাড়িয়ে দিয়েছিল একদিন, তাদেরই মধ্যে একজন উঠে দাঁড়াল। লোকটি এদের নেতাগোছের। উঠে দাঁড়িয়ে সে জানাল যে, আজকের মতো সভাভঙ্গ করা হচ্ছে। তারপর বলল, শহরের মধ্যে কোথাও মিলিত না হয়ে কেন যে তাঁরা তাঁদের সমবেত প্রার্থনানুষ্ঠানের জন্যে এমন একটি জায়গা বেছে নিয়েছেন, তা তাঁদের কারুর অজানা নয়। এরপর তাঁরা অন্য কোথাও মিলিত হবেন। কিন্তু ঠিক কোথায়, এখনও তা কিছু বলতে পারা যাচ্ছে না। তবে হ্যাঁ, প্রভুর আশীর্বাদে পরবর্তী অনুষ্ঠানের জন্যেও যে নিরাপদ কোনো জায়গা খুঁজে পাওয়া যাবে তাতে তাঁদের সন্দেহ নেই। প্রভুই তাঁদের সর্ব বিপদ থেকে রক্ষা করবেন। তাঁরা তো নিরীহ মেষপাল মাত্র, প্রভুই তাঁদের রক্ষক। তাঁদেরকে তিনি পরিত্যাগ করবেন না। এবং···

বাকি কথাগুলি বারাব্বাসের কানে গেল না। সে ততক্ষণে বাইরে চলে এসেছে। এতক্ষণে তার স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল।

আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাই তার এখন কদর্য লাগছে।

দু-একদিনের মধ্যেই নির্যাতন শুরু হয়ে গেল। বিচারের নামে সে-এক বীভৎস অত্যাচার। ভাঙ্‌ গেটের সেই যে ছেলেটি, সর্বক্ষণই যে হাঁপাত, অন্ধ-বুড়ো একদিন তাকে সঙ্গে নিয়ে জেরুসালেমের আদালতে গিয়ে তার নালিশ জানিয়ে এল। সেখানে গিয়ে সে বলল :

—'ভাঙ গেটে আমাদের আস্তানার কাছে একটি মেয়ে থাকে ; আশপাশের লোকদের মধ্যে সে যা-তা সব গুজব রটিয়ে বেড়াচ্ছে। বলছে, কে নাকি তার এক ত্রাণকর্তা আছেন, পৃথিবীকে তিনি পালটে দেবেন। আজকের এই পৃথিবীকে তিনি ধ্বংস করবেন, তারপর সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকেই নতুন-পৃথিবীর অভ্যুদয় হবে। একমাত্র তাঁর কথা ছাড়া অন্য আর কারুর কথাই সেখানে খাটবে না। বলুন, এ কি মিথ্যে নয়? আর এইসব মিথ্যে রটানো ছাড়া মেয়েটির আর অন্য কোনো কাজ নেই। এ মেয়ে সর্বনেশে। পাথর ছুড়ে হত্যা করলে তবেই এর উপযুক্ত শাস্তি হয়। ঠিক কিনা?'

বিচারক ধর্মবুদ্ধিপরায়ণ লোক। এইটুকু শুনেই তিনি রায় দিতে রাজী নন। বুড়োকে তিনি সব খুলে বলতে বললেন। প্রথমত, এই ত্রাণকর্তাটি কে? বুড়ো তাতে বলল যে, অতশত সে জানে না। তবে হ্যাঁ, এই লোককে বিশ্বাস করবার অপরাধেই আরো-অনেককে এর আগে হত্যা করা হয়েছে। মেয়েটিকে সে বলতে শুনেছে যে, এই ত্রাণকর্তাই তার প্রভু। প্রভুই সবাইকে রক্ষা করবেন। কুষ্ঠরোগীদেরও তিনি দূরে সরিয়ে রাখবেন না। তাদের তিনি রোগমুক্ত করবেন, সুস্থ করে তুলবেন। আর-পাঁচজনের মতো কুষ্ঠরোগীরাও তখন অবাধে সব জায়গায় যেতে পারবে। তা যদি হয় তো বড়ই ভয়ের কথা। এখন তবু তাদের সঙ্গে একটা করে ঘণ্টা থাকে, ঘণ্টার শব্দ শুনে সবাই সতর্ক হয়ে যায়। তা-ও যদি তখন না থাকে তো যে-কোনো মুহূর্তেই তাদের সঙ্গে সকলের ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যেতে

পারে; বিশেষ করে যারা অন্ধ তাদের কাছে এটা আরও আশ্চর্য কথা। এছাড়া এই যে সব রটিয়ে বেড়াচ্ছে মেয়েটি, একি অন্যায় নয়?

বিচারক ঈষৎ চিন্তিতভাবে তাঁর চিবুকের তলায় বড় বড় খোঁচা ঘষতে লাগলেন; অন্ধ-বুড়ো তার শব্দ পর্যন্ত শুনতে পেল। তারপরেই তিনি প্রশ্ন করলেন:

—মেয়েটিকে কেউ বিশ্বাস করে?

—করে। বলতে কি ভাঙ্ গেটের ওখানে একদল লোক আছে, এই ধরনের সব উদ্ভট কথা পেলে তারা আর অন্য কিছুই শুনতে চায় না। সব চাইতে বেশী বিশ্বাস করে কুষ্ঠরোগীরা। সময় নেই অসময় নেই, মেয়েটি তাদের সঙ্গে গিয়ে মেলামেশা করছে। কুষ্ঠরোগীদের জন্যে যে আলাদা একটুখানি জায়গা ঘিরে দেওয়া হয়েছে, কয়েকবারই মেয়েটি সেখানে গিয়েছিল। এ নিয়ে আর এখন কানাঘুষোর অন্ত নেই। মেয়েটি নাকি তাদের কাছে গিয়ে নষ্ট হয়েছে। আগে আমি এসব কিছুই জানতাম না। হালে এসব কানে আসছে। মেয়েটির বিয়ে হয়নি এখনো; কিন্তু আর যা-ই হোক, ও-মেয়ে কুমারী নয়। লোকে তো বলে, একটি ছেলেও হয়েছিল; নিজেই ও তাকে হত্যা করেছে। তবে হ্যাঁ, সত্যিমিথ্যে আমি জানি না। পাঁচজনে পাঁচকথা বলে; আর আমিও যখন কালা নই, দু-চারটে কথা আমার কানেও যায়। কানে আমি ঠিকই শুনতে পাই; চোখ দুটিই শুধু অন্ধ। অন্ধ হওয়া বড় দুর্ভাগ্য প্রভু, বড়ই দুর্ভাগ্য।

বিচারক সে-কথায় কান না দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কুশবিদ্ধ যে-লোকটিকে মেয়েটি ত্রাণকর্তা বলে রটিয়ে বেড়ায়, মেয়েটির মারফতে কি তার অনেক শিষ্যও জুটে গিয়েছে?

—নিশ্চয়ই। তার কারণ প্রত্যেকেই চায় সেরে উঠতে। মেয়েটিও তাই রটিয়ে দিয়েছে যে, কানা হোক, খোঁড়া হোক্—প্রত্যেককেই তিনি সারিয়ে তুলবেন। পৃথিবীর কোনোখানেই আর তিনি কোনো দুঃখ রাখবেন না। ভাঙ্ গেটে তো না-ই, কোনোখানেই না। শুনে তার অঢেল শিষ্য জুটে গিয়েছিল। এখন অবশ্য তারা চটাচটি আরম্ভ করে দিয়েছে। মেয়েটি তাদের কথা দিয়েছিল যে, শীগগীরই

আবার তাঁর দেখা পাওয়া যাবে। এদিকে তাঁর দেখা নেই। সবাই তাই একটু বেঁকে বসেছে। মেয়েটিকে তারা সর্বক্ষণই কথা শোনাচ্ছে এখন, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে। এইটেই স্বাভাবিক। তবে হ্যাঁ, কুষ্ঠরোগীরা অবশ্য এখনও বিশ্বাস করে তাকে। যেভাবে মেয়েটি তাদের কানে রাতদিন সব মন্ত্র ঢালছে, বিশ্বাস না করে আর উপায় কি। এমন কথাও সে তাদের বলেছে যে, কুষ্ঠরোগীদের তো এখন কেউ মন্দিরে ঢুকতে দেয় না, প্রভু তাদের মন্দিরেও নিয়ে যাবেন।

—কুষ্ঠরোগীদের? কী সর্বনাশ!

—হ্যাঁ, তাদেরকেও।

—মেয়েটি কি পাগল নাকি? পাগল ছাড়া কেউ বলে একথা?

—মেয়েটি তো কিছু বলে না, তার প্রভুই তাকে দিয়ে বলান। প্রভুর নাকি অসীম ক্ষমতা। সব ইচ্ছাই তিনি পূর্ণ করতে পারেন, সবকিছুকেই তিনি পালটে দিতে পারেন। কোনো কিছুই তার অসাধ্য নয়; তিনি ঈশ্বরপুত্র।

—ঈশ্বরপুত্র!

—হ্যাঁ, তাই।

—মেয়েটি কি তাই বলে নাকি?

—শুধু কি বলে, এ তার দৃঢ় বিশ্বাস। আস্পর্দার বহরটা একবার দেখুন; স্বচক্ষে যাকে সবাই ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মরতে দেখেছে, সে কিনা ঈশ্বরপুত্র! আর মেয়েটিও কিনা স্বচ্ছন্দে তাই রটিয়ে বেড়াচ্ছে! শুধুমাত্র এই অপরাধেই ওর শাস্তি হওয়া উচিত। লোকটিকে যারা ক্রুশবিদ্ধ করবার আদেশ দিয়েছিলেন, ভেবেচিন্তেই দিয়েছিলেন। ঠিক কিনা

—আমিও তাঁদের মধ্যে ছিলাম।

—তবে তো আর কথাই নেই, সবই আপনি জানেন।

চুপচাপ কাটল কিছুক্ষণ। বিচারক তাঁর চিবুকের ডগায় মৃদুমন্দ টোকা মারছেন। অন্ধবুড়ো তার শব্দ শুনে বুঝল যে, তিনি এখন চিন্তানিরত। তারপর একসময় সেই মৃত্যুহিম স্তব্ধতা ভঙ্গ করে তিনি বললেন যে, মেয়েটির এই

অদ্ভুত বিশ্বাসের জন্যে আদালতে ডেকে নিয়ে এসে তার কাছে কৈফিয়ৎ তলব করা হবে।

মাথা নিচু করে অন্ধবুড়ো তাঁকে ধন্যবাদ জানাল। দেয়াল ধরে ধরে সে বাইরে আসবার চেষ্টা করছিল ; অবস্থা দেখে তাকে সাহায্য করবার জন্যে বিচারক তাঁর একজন ভৃত্যকে ডেকে পাঠালেন। তারপর, মেয়েটি যে সত্যিই অপরাধী, সে বিষয়ে পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হবার জন্যে শেষবারের মতো তাকে প্রশ্ন করলেন :

—মেয়েটির বিরুদ্ধে তোমার ব্যক্তিগত কোনো আক্রোশ নেই তো ?

—আক্রোশ ! আক্রোশ কেন থাকবে ? কারুর বিরুদ্ধেই আমার কোনো আক্রোশ নেই। আমি অন্ধ, এদের আমি চেহারা পর্যন্ত দেখিনি। আর শুধু এদের বলেই নয়, কাউকেই কখনো আমি দেখিনি। আক্রোশ কেন থাকবে ? যা সত্যি, তাই শুধু আপনাকে জানালাম।

ভৃত্যটি তাকে বাইরে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে এল। ফটকের বাইরে সেই ছেলেটি তখনো অপেক্ষা করছিল ; অন্ধবুড়ো তার শ্বাস টানার শব্দ শুনতে পাচ্ছে। হাতড়ে হাতড়ে সে তার হাত ধরল গিয়ে। তারপর দুজনে মিলে তারা আড্‌ গেটের দিকে রওনা হয়ে গেল।

রায় দেওয়া হলো, মেয়েটি অপরাধী ; আর এই অপরাধের জন্যে তাকে হত্যা করা হবে। শহরের দক্ষিণ দিকে বিরাট যে-একটি গহ্বর রয়েছে, একটু বাদেই তাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হলো। রায় শুনবার জন্যে প্রচুর লোক আদালতে গিয়ে জমা হয়েছিল। সারাটা পথ চিৎকার করতে করতে এসেছে। মন্দির-রক্ষী একজন কর্মচারীও তাঁর সান্ত্রীদের নিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছেন। সান্ত্রীদের চুল এবং দাড়ি ফিতে-বাঁধা ; পা থেকে কোমর পর্যন্ত অনাবৃত। প্রত্যেকের হাতেই ষাঁড়ের চামড়ার দীর্ঘ এক-একখানি চাবুক। চাবুক আস্ফালন করে তারা শান্তিরক্ষা করছে। সান্ত্রীদেরই একজন মেয়েটিকে সেই গহ্বরের মধ্যে

দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখে এল। উত্তেজিত জনতাও ততক্ষণে সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে। গহ্বরের মুখে বড় বড় সব পাথর ছড়ানো; আর তার গায়ে চাপ চাপ রক্তের দাগ। স্পষ্টই বোঝা যায়, ইতিপূর্বে তারা আরো অনেককে এইভাবে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করেছে।

সৈন্যাধ্যক্ষ হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন "চুপ, চুপ।" মুহূর্তে সবাই শান্ত হয়ে গেল। আর সেই ভৌতিক নিস্তব্ধতার মধ্যে নগর-পুরোহিতের একজন সহকারী তাঁর ধীরমন্থর কণ্ঠে রায় পাঠ করে শোনাতে লাগলেন। মৃত্যুদণ্ডের কারণ বর্ণনা করে তারপর তিনি বললেন যে, মেয়েটির বিরুদ্ধে যে এসে অভিযোগ উত্থাপন করেছে, তাকেই সর্বপ্রথম পাথর ছুড়তে হবে। অন্ধ বুড়োকে তখন গহ্বরের ধারে নিয়ে যাওয়া হলো। একজন তাকে বুঝিয়ে বলল ব্যাপারটা। কিন্তু বোঝা গেল যে, ব্যবস্থাটা তার মনঃপূত হয়নি।

—কেন, আমি কেন ওকে পাথর ছুঁড়তে যাব? আমি কেন? আমি তো ওকে দেখিনি পর্যন্ত...

সবাই তাকে বুঝিয়ে বলল যে, এইটেই হলো আইন। আইনের নির্দেশ, এ কি অমান্য করা যায়? অনিচ্ছা সত্ত্বেও বুড়ো এগিয়ে এল তখন। কে একজন তার হাতে একখণ্ড পাথর তুলে দিতেই পাথরখানাকে সে সামনে ছুঁড়ে মারল। তারপর আবার, আবার। এবং প্রতিবারেই সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে লাগল। অন্ধ, লক্ষ্যবস্তুকে সে দেখতেও পাচ্ছে না। কী করে সে লক্ষ্যভেদ করবে। এলোপাথারি সে পাথর ছুড়ে যেতে লাগল শুধু। বারাব্বাস তার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল; দৃষ্টি তার মেয়েটির দিকে নিবদ্ধ। এবারে সে চোখ ফিরিয়ে দেখল যে, বুড়োকে সাহায্য করবার জন্যে কে একজন এগিয়ে এসেছে। লোকটির চেহারা রুক্ষ, কঠিন। আর তার কপালের একধারে চামড়ার একটি ছোট্ট খাপ লটকানো; তার মধ্যে আইনের নির্দেশনামা রয়েছে। লোকটি বোধ হয় একজন কলমচি। বুড়োর হাতের মধ্যে একখণ্ড পাথর তুলে দিয়ে হাতখানাকে সে সামনে এগিয়ে ধরল। টিপ ঠিক করে দিল। তারপর সজোরে নিক্ষিপ্ত হলো সেই পাথর। এবং এবারেও লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। গহ্বরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি;

চোখ দুটি উজ্জ্বল, বিস্ফারিত। সে জানে, মৃত্যু তার অবধারিত। সেই মুহূর্তের জন্যেই সে এখন প্রতীক্ষা করছে।

এত করেও যখন কিছু হলো না, লোকটি অধৈর্য হয়ে উঠল। মাথা নিচু করে বড় আর ধারালো একখণ্ড পাথর কুড়িয়ে নিল সে। তারপর প্রাণপণ শক্তিতে সেই পাথর ছুড়ে মারল। এবারে আর সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো না। অল্প একটু টলে উঠল মেয়েটি, তারপর আছড়ে পড়ে গেল। শীর্ণ দুর্বল হাত দু'খানি তার সামনের দিকে প্রসারিত; অসহায়ের মতো কী যেন আঁকড়ে ধরতে চাইছে। জনতা ওদিকে উল্লাসে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। চিৎকারে আর কানপাতা যায় না। লোকটির দিকে ফিরে তাকাল বারাব্বাস; দেখল যে, লক্ষ্যভেদের আনন্দে তার সারামুখ উদ্ভাসিত। পা টিপে বারাব্বাস তার দিকে এগিয়ে গেল, তারপর তার জামাটা একটু তুলে ধরেই লম্বা একখানা ছুরি বসিয়ে দিল সে। এ কাজে তার দীর্ঘদিনের অভ্যাস। ব্যাপারটা কেউ টের পর্যন্ত পেল না। আর তা ছাড়া সকলেই তখন পাথর ছোড়ায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে; টের পাবার তাই কথাও নয়।

কার্যোদ্ধার করে গহ্বরের ধারে গিয়ে দাঁড়াল বারাব্বাস। টলতে টলতে মেয়েটি এগিয়ে আসছে; হাত দু'খানি সামনে প্রসারিত। সেই অবস্থাতেই সে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল:

—এসেছেন! তিনি এসেছেন!··· আমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছি! দেখতে পাচ্ছি!···

সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল মেয়েটি। মনে হলো যেন সে এক অলক্ষ্য পুরুষের বস্ত্রপ্রান্ত আঁকড়ে ধরেছে। অনুনয়কাতর কণ্ঠে বলছে:

—প্রভু, কী করে আমি তোমার হয়ে সাক্ষ্য দেব বলো। আমি অক্ষম! আমাকে তুমি ক্ষমা করো, ক্ষমা···

পাথরে পাথরে রক্ত-মাখামাখি; তারই উপরে মেয়েটি আছড়ে পড়ল আবার। আর উঠল না।

হত্যাপর্ব সমাপ্ত হবার পরে অবাক হয়ে সবাই দেখল যে, জনতার মধ্যেও

যেন কে-একজন মরে পড়ে আছে। আর অন্য একজন লোকও হঠাৎ সেখান থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। অলিভ-অরণ্যের শাখায় শাখায় তখন অন্ধকার নেমে এসেছে; সেই অন্ধকারের মধ্যে যে সে কোথায় মিলিয়ে গেল কেউ বুঝতেই পারল না। জনকয়েক যাত্রী অবশ্য তার পিছু নিয়েছিল, তাতে কোনো লাভ হয়নি। ধরিত্রীই যেন তাকে গ্রাস করে ফেলেছে।

সন্ধ্যার একটু পরেই আবার গা-ঢাকা দিয়ে ফিরে এল বারাব্বাস। গহ্বরের গা বেয়ে বেয়ে সে নীচে নেমে গেল। অন্ধকারে পথ ঠাহর হয় না, হাতড়ে হাতড়ে সামনে এগোতে হয়। একটু এগিয়েই সে মেয়েটিকে দেখতে পেল। স্তূপীকৃত পাথরের নীচে তার মৃতদেহ প্রায় চাপা পড়ে গিয়েছে। সর্বাঙ্গ চূর্ণবিচূর্ণ। স্পষ্টই বোঝা যায় যে, মৃত্যুর পরেও বহুক্ষণ ধরে তার উপরে শিলাবৃষ্টি হয়েছে। মৃতদেহটিকে তুলে নিয়ে গহ্বরের থেকে বেরিয়ে এল বারাব্বাস, তারপর অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে পথ হাঁটছে। কাঁধের থেকে মৃতদেহটিকে মাঝে মাঝে সে সামনে নামিয়ে রেখে একটু জিরিয়ে নেয়, তারপর ফের পথ চলতে শুরু করে। আকাশ এখন মেঘমুক্ত, নক্ষত্রগুলি সব ঝক্‌ঝক্ করছে। এতক্ষণ চাঁদ ছিল না, এবারে চাঁদও উঠল। মেয়েটির মুখের দিকে তাকাল বারাব্বাস। আশ্চর্য; এত যে ওরা পাথর ছুঁড়েছে, মুখখানি তবু বিকৃত হয়নি। পাণ্ডুর, প্রায়-স্বচ্ছ মুখ। মৃত্যুর পরেও তার কোনো বিকৃতি ঘটেনি। শুধু ঠোঁটের উপরকার সেই কাটা-দাগটি আর এখন চোখে পড়ে না। না পড়ুক, কিছুই আর তাতে যায় আসেনা। সব কিছুই এখন অর্থহীন।

এই মেয়েকেই বারাব্বাস একদিন প্রেম নিবেদন করেছিল। সেদিনকার কথা আজ আবার তার মনে পড়ল। মেয়েটিকে সে যখন—না, এ নিয়ে সে আর ভাববে না কিছু।···কিন্তু তাকে যখন সে তার ভালবাসার কথা

জানিয়েছিল, জানিয়েছিল যে সে তাকে নিজের মতো করে পেতে চায়। সারামুখ তার উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। বারাব্বাসের তা মনে আছে। অন্য আর কেউ কখনো তাকে প্রেম নিবেদন করেনি। আর বারাব্বাসের প্রেমও যে মিথ্যে, নেহাৎই মিথ্যে, তাও বোধ হয় সে জানত। জানত, তবু খুশী হয়েছিল! নাকি জানত না? সে যাই হোক, যা-কিছু তার কাছে প্রার্থনা করেছে বারাব্বাস, পেয়েছে। তার কাছে যা অপরিহার্য, যা না হলে সে বাঁচতে পারে না, মেয়েটি তা তাকে দিয়েছে। রোজই দিয়েছে। এতখানি সে হয়তো চায়ওনি। মেয়েটির গলা একটু কর্কশ, আর সেই কর্কশ গলায় সে জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলত। বারাব্বাসের তাতে অসহ্য বিরক্তি লাগত এক-এক সময়। সে-কথা সে তাকে বলেও দিয়েছিল। বলেছিল যে, সে যেন অতো বাজে না বকে। হাতের কাছে তখন আর অন্য কোনো মেয়ে ছিল না, তাই; বাধ্য হয়েই বারাব্বাসকে তখন এই মেয়েকে দিয়েই কাজ চালিয়ে নিতে হয়েছে। পার্ সারবার পরে সে আর ফিরেও তাকায়নি অবশ্য, তৎক্ষণাৎ তাকে পরিত্যাগ করেছে। তা ছাড়া সে আর কী-ই বা করতে পারত।

সামনেই আদিগন্ত মরুভূমি; বিবর্ণ জ্যোৎস্নায় তাকে ক্লান্ত, নিষ্প্রাণ দেখাচ্ছে। যে দিকেই চাও, সেই একই দৃশ্য, একই ক্লান্তি, একই শূন্যতা ছড়িয়ে আছে। বারাব্বাস তা জানে।

পরস্পরকে ভালবাসো……

মাথা নিচু করে আর-একবার সে মেয়েটির দিকে তাকাল। তারপর তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে সে পথ চলতে শুরু করল।

উট আর খচ্চরে-হাঁটা পথ। জেরুসালেমের থেকে শুরু হয়ে জুডার মরুভূমির মধ্য দিয়ে এ-পথ মোয়াবাইট-ভূমিতে গিয়ে পড়েছে। পথ-চলতি ভারবাহী পশুর পিঠ থেকে পড়ে-যাওয়া টুকিটাকি দু-একটা জিনিস এখানে ওখানে ছড়িয়ে পড়ে আছে। এক-আধটা কঙ্কালও মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। ধবধবে সাদা ক'খানা অস্থি মাত্র; ক্ষুধার্ত শকুনের দল তার উপর থেকে ঠুকরে ঠুকরে মাংস তুলে নিয়েছে। এখন প্রায় মধ্যরাত্রি। এতক্ষণ সে চড়াই ভেঙে এসেছে, সামনে

এবারে উৎরাই শুরু। পথও প্রায় শেষ হয়ে এল। ছোটখাটো দু-একটা গহ্বর পার হয়ে এসে অল্পক্ষণের জন্যে থেমে দাঁড়াল বারাব্বাস। আর-একটা মরুভূমি তার সামনে। আগের চাইতে এটি আরো দুর্গম, আরো বন্ধুর। এটিও তাকে পার হতে হবে। পথশ্রমে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এবারে একটু জিরিয়ে নেবে। আর বেশী দেরি নেই। সামনের এই বালুরাশি পার হতে পারলেই তার যাত্রাশেষ।

জায়গাটা সে খুঁজে নিতে পারবে তো? না কি এখানকার সেই বুড়োর কাছে একবার জিজ্ঞেস করে নেবে? না, তার দরকার নেই। যা করবার সে একাই করবে। কী দরকার তার অন্য কারুর কাছে গিয়ে? বুড়ো হয়তো এর অর্থই বুঝতে পারবে না। বারাব্বাস নিজেই কি পেরেছে? সত্যিই তো, সাতরাজ্য ডিঙিয়ে মেয়েটিকে সে এখানেই বা নিয়ে আসতে গেল কেন? কেন আবার, তার আত্মা এখানে শান্তিলাভ করবে, তাই। এই তার উপযুক্ত জায়গা। গিলগলে কি কেউ তাকে শান্তি দিত? দিত না। আর জেরুসালেমে পড়ে থাকলে তার এই মৃতদেহ এতক্ষণে কুকুর দিয়ে খাওয়ান হত। সেই অসম্মানের থেকে বাঁচাবার জন্যেই বারাব্বাস তার মৃতদেহকে এখানে সরিয়ে নিয়ে এসেছে। বাঁচাবার জন্যে? মৃতকে কি কেউ বাঁচাতে পারে? নাকি কোনো দরকার হয় তার? সম্মান-অসম্মান সবই তো তার কাছে সমান। আর তা ছাড়া এখানেই কি মেয়েটি শান্তি পাবে? এখানেও কি একদিন তাকে নির্বাসিতের জীবন যাপন করতে হয়নি? একটিই মাত্র সান্ত্বনা আছে এখন। মেয়েটির মৃত-শিশুকে এখানে কবর দেওয়া হয়েছে; তাকেও এবারে সেই একই শয্যায় শুইয়ে দেওয়া হবে। এই এখন তার একমাত্র শান্তি, তার একমাত্র সান্ত্বনা। কিন্তু এরই বা কী মূল্য? কিছুমাত্রও মূল্য নেই। সম্পূর্ণই নিরর্থক। বারাব্বাস তা জানে। জেনেও সে সেই অর্থহীন কাজই করে যাচ্ছে। কেউ তাকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে। যে বেঁচে নেই, তাকে তুষ্ট করা বড় কঠিন।

জেরুসালেমে যাবার কী এমন দরকার পড়েছিল মেয়েটির? অনকয়েক উন্মাদ মিলে রটিয়ে বেড়াচ্ছে যে, পৃথিবীতে একজন ত্রাণকর্তার আবির্ভাব হয়েছে; রটিয়ে বেড়াচ্ছে যে, সবাইকেই তাঁর জন্মভূমিতে গিয়ে মিলিত হতে হবে। এদের সঙ্গে

গিয়ে না জুটলে কি তার চলছিল না? তার চেয়ে সে যদি সেই বুড়োর কথা মেনে চলত, এমনভাবে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হত না। বুড়ো এসব হুজুগে মেতে ওঠেনি। বলেছিল যে, এসব তার অনেক দেখা আছে। এরকম লোক-ঠকানো ত্রাণকর্তা সে অনেক দেখেছে। কে বলবে, এ-ও তেমন একজন নয়? মেয়েটি সেসব শোনেনি। না শুনে সে উন্মাদদের সঙ্গে গিয়ে জুটেছিল।

আর তার ফলও সে হাতে-হাতেই পেয়েছে। বারাব্বাস তার মৃতদেহের দিকে তাকাল। চূর্ণবিচূর্ণ, রক্তাক্ত। কিনা সে তার ত্রাণকর্তার জন্যে সব তুচ্ছ করেছিল। ত্রাণকর্তা! সত্যি?

সত্যি? সত্যিই কি তিনি এই পৃথিবীর ত্রাণকর্তা? মানুষকে তিনি রক্ষা করবেন? তা-ই যদি হবে তো মেয়েটিকে তিনি রক্ষা করলেন না কেন? কেন তাকে এভাবে মরতে দিলেন? কই, বাঁচাতে পারলেন না তো?

ইচ্ছে করলেই পারতেন। ইচ্ছে করলেই মেয়েটিকে তিনি বাঁচাতে পারতেন। সে ইচ্ছে তাঁর হয়নি। তার কারণ, নিজেরই হোক আর অন্যেরই হোক, যন্ত্রণাকেই তিনি ভালবাসেন। ভালবাসেন যে, অন্যেরা তাঁর হয়ে সাক্ষ্য দিক, তাঁর হয়ে যন্ত্রণাভোগ করুক। "তোমার হয়ে তুমি আমাকে সত্যজ্ঞাপন করতে বলেছিলে, তোমার আদেশই আমি পালন করলাম।"…"মৃত্যুর ওপার থেকেও তোমার জন্যে আমি সাক্ষ্য দিতে এসেছি।"

না ক্রুশবিদ্ধ সেই লোকটিকে তার ভাল লাগেনি। সে তাঁকে ঘৃণা করে। তিনিই একে হত্যা করেছেন। মেয়েটি তাঁর জন্যে মৃত্যুবরণ করুক, এ-ই তিনি চেয়েছিলেন। মৃত্যুর থেকে তিনি ওকে বাঁচাতে চাননি। সকলের অলক্ষ্যে তিনি সেই বধ্যভূমিতে এসে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আর কেউ না জানুক, বারাব্বাস তা জানে। মেয়েটি যে তাঁর দিকে দু-হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, সে তো তাঁর মমতালাভের জন্যেই। প্রাণপণ শক্তিতে সে তাঁর বস্ত্রের প্রান্তভাগ আঁকড়ে ধরেছিল, সে-ও তাঁর সাহায্যলাভের জন্যেই। সাহায্য তিনি করেননি। করতে পারতেন, তবু করেননি। আর এই নির্মম পুরুষই কিনা ঈশ্বরপুত্র। ঈশ্বরের প্রিয়তম পুত্র! মানুষের ত্রাণকর্তা!

বারাব্বাসের যা করবার সে করেছে। প্রথম যে-লোকটা পাথর ছুড়ে মেরেছিল, ছোরা মেরে সে তাকে হত্যা করেছে। সেটুকু যে করতে পেরেছে তাইতেই সে খুশী। তাতে অবশ্য কোনো লাভ হয়নি। তার আগেই মেয়েটি আহত হয়েছিল। ছোরা মেরেও তাই কোনো ফল হলো না। না হোক, তবু সে তার কর্তব্য করেছে।

হাতের উল্টো-পিঠ দিয়ে মুখ মুছে নিয়ে আপনমনেই একবার হেসে উঠল বারাব্বাস। তারপর একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মৃতদেহটি তুলে নিয়ে সে ফের উঠে দাঁড়াল। পথ চলতে তার এখন ক্লান্তি লাগছে।

একটু এগিয়েই সেই বুড়োর আস্তানা। দেখেই বারাব্বাস চিনতে পারল। কোথায় যে শিশুটিকে কবর দেওয়া হয়েছে, সেবারে এই বুড়োই তা তাদের চিনিয়ে দিয়েছিল। জায়গাটা তার এখন মনে নেই; তবে একবার যখন এসেছে, এবারেও ঠিক চিনে নিতে পারবে। ডানদিকে থাকে কুষ্ঠরোগীরা, আর সামনের দিকে সেই উন্মাদদের আড্ডা। না, অতো দূরে নয়। আর-একটু এগিয়েই বারাব্বাস চিনতে পারল, এ-ই সেই জায়গা। চাঁদের আলোয় অবশ্য অন্যরকম দেখাচ্ছে। তা দেখাক, এ-ই যে সেই জায়গা, তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই। এইখানেই এসেছিল তারা। বুড়োর কাছেই সে শুনেছে যে, মাতৃজঠরেই শিশুটি মারা গিয়েছিল। এ শিশু অভিশপ্ত, অপবিত্র। ভূমিষ্ঠ হবার পরক্ষণেই বুড়ো তাই তাকে কবর দিয়েছে, কিছুমাত্রও দেরি করেনি। তোমার সন্তান অভিশপ্ত হোক্। মা তখন আসতে পারেনি; পরে সে মাঝে মাঝে এখানে এই কবরের পাশে এসে বসে থাকত।···সারাক্ষণই বুড়ো এইসব বলে যাচ্ছিল।

আর-একটু এগিয়েই চোখে পড়ল বারাব্বাসের। এ-ই সেই কবর।

পাথরের ঢাকনাটাকে তুলে ধরে মেয়েটিকে সে ধীরে ধীরে শুইয়ে দিল তার মধ্যে। রক্তাক্ত হাত দুখানিকে সযত্নে একটু গুছিয়ে রাখল। শেষবারের মতো তার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর সেই পাথরখানাকে ফের কবরের মুখে নামিয়ে দিল। বারাব্বাসের এবারে ছুটি। সামনেই তার ধু ধু মরুভূমি। চাঁদের আলোয় তার উপরে এক বিবর্ণ-হলুদ ক্লান্তি ছড়িয়ে গিয়েছে। মৃত্যুলোকের

প্রতিচ্ছবি যেন। মৃত্যুলোক! এতক্ষণে সে মৃত্যুলোকে গিয়ে প্রবেশ করেছে। বারাব্বাসই পৌঁছে দিয়েছে তাকে। নিজের শিশুসন্তানের পাশেই সে এখন চিরনিদ্রায় মগ্ন। কিন্তু কী তাতে আসে যায়? কিছুই না। বারাব্বাসের যা কর্তব্য, সে করেছে। লালচে দাড়ির গুচ্ছে মৃদু-মৃদু টোকা মারতে মারতে আপন মনেই সে হেসে উঠল আবার।

পরস্পরকে ভালবাসো…

বারাব্বাস যখন তার বন্ধুবান্ধবদের কাছে ফিরে এল, তার মধ্যে এক আমূল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। প্রথমটায় কেউ তাকে চিনতেই পারল না। তার এই পরিবর্তনের খানিকটা আভাষ তারা জেরুসালেমেই পেয়েছিল বটে, তবে তাতে খুব বিচলিত হয় নি। ভেবেছিল যে, দীর্ঘদিন বেচারা কারারুদ্ধ হয়ে ছিল, তারপর মরতে মরতে ছাড়া পেয়েছে—তাই হয়তো এই ভাবান্তর ঘটে থাকবে; ভেবেছিল যে, দু-একদিন বাদেই সে আবার সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষ হয়ে উঠবে। বহুদিন কেটে গিয়েছে তারপর, তবুও সে তার স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে পায় নি; বরং যে পরিবর্তনের তারা আভাষমাত্র পেয়েছিল, সেইটিই এখন দৃঢ়মূল হয়ে তার উপরে চেপে বসেছে। কী এর কারণ, তারা জানে না। শুধু জানে যে, বারাব্বাস আর এখন আগের সেই স্বাভাবিক-মানুষটি নয়।

অবশ্য, সত্যি বলতে কি, চিরকালই ওর হাবভাব একটু অদ্ভুত। এত অন্তরঙ্গতা এত ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও কেউ ওকে ঠিক চিনে উঠতে পারে নি, কোথায় যেন একটা ব্যবধান থেকে গেছে। কিন্তু তাই বলে কি আজকের এই অবস্থার সঙ্গে তার কোনো তুলনা চলে। সমস্ত পরিচয় ধুয়ে মুছে দিয়ে সম্পূর্ণ ই অচেনা এক মূর্তিতে সে আজ সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কেউ কাউকে চেনে না, কখনো দেখে নি পর্যন্ত। লুঠ-তরাজের আঁটঘাট নিয়ে যখন তারা কথা বলতে আসে, সে-কথায় সে মনই দেয় না। পরামর্শ দেওয়া দূরে থাক, কেমন যেন উদাসভাবে

সে তাকিয়ে থাকে। সবকিছু সম্পর্কেই সে এখন নিস্পৃহ, নির্বিকার। জর্ডন উপত্যকায় গিয়ে যখন তারা হানা দেয়, মরুবাসীদের উপরে লুটপাট চালায়, বারাব্বাস তাতে অংশগ্রহণ করে ঠিকই, তবে গা লাগায় না। তাই বলে যে বিপদ-বিঘ্নে ও কিছু ভয়গ্রস্ত, তা-ও নয়। আসলে ও এখন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে, কোনো কিছুতেই ওর আর তেমন মন নেই। একদিন শুধু এই মনমরা ভাবটা হঠাৎ কেটে গিয়েছিল বারাব্বাসের। জেরিকো অঞ্চলের থেকে কারা যেন সেদিন নগর-পুরোহিতের খাজনা নিয়ে যাচ্ছিল। সঙ্গে তাদের মন্দির-রক্ষী দুজন প্রহরী। বারাব্বাস সেদিন প্রায় ক্ষেপে গিয়েছিল বললেই চলে; রক্ষী দুজনকে হত্যা করতে সেদিন ওর এতটুকুমাত্র দ্বিধা হয়নি। অথচ এর কোনো দরকার ছিল না; আক্রমণ চালাবার সঙ্গে সঙ্গেই তারা আত্মসমর্পণ করেছিল। তা সত্ত্বেও বারাব্বাস তাদের রেহাই দেয় নি। লোক দুজনকে সে টুকরো টুকরো করে কেটেছে, তারপর তাদের খণ্ড-বিখণ্ড মৃতদেহের উপরে সে প্রায় উন্মত্তের মতই থুথু ছুড়েছে। সে এক পৈশাচিক উল্লাস। বন্ধুদের সেটা ভাল লাগেনি, বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়েছে। প্রহরীদের তারা ঘৃণা করে, নগর-পুরোহিত আর তার সাঙ্গো-পাঙ্গোদেরও। কিন্তু তাই বলে কারুর মৃতদেহকে তারা অসম্মান করতে রাজী নয়। মৃতেরা পড়ে মন্দিরের এলাকায়, আর মন্দির হলো ঈশ্বরের। মৃতকে অসম্মান করলে তাই ঈশ্বরকেই অসম্মান করা হয়। বন্ধুরা সেদিন ভয়ই পেয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু ঐ একদিনই। একদিন একটু ঝলসে উঠেই সে আবার নিভে গিয়েছে। দলে থাকতে হলে প্রত্যেককেই কিছু-না-কিছু কাজ করতে হবে; সেইটেই নিয়ম। কাজে আর বারাব্বাসের উৎসাহ নেই; সে এখন নিয়মরক্ষা করে মাত্র। জর্ডন নদীর এক খেয়াঘাটে যেদিন রোমান পাহারাদারদের উপরে আক্রমণ চালান হলো, সেদিনও তার কোনো উৎসাহ দেখা যায় নি। অথচ এই রোমানরাই বারাব্বাসকে ক্রুশবিদ্ধ করতে চেয়েছিল। দলের আর-সবাই সেদিন মেজাজে ছিল, তাই রক্ষে। প্রতিটি সৈন্যকে হত্যা করে তারা নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছে, একটিকেও তারা পালাতে দেয়নি। অত্যাচারী এই রোমানদের যে বারাব্বাস ঘৃণা করে, তা তারা

; সে ব্যাপারে তাদের এতটুকুও সন্দেহ নেই। তা সত্ত্বেও যে সেদিন তার কোনো উৎসাহ দেখা গেল না, তাতে তারা অবাক হয়ে গিয়েছে। অবাক হবারই কথা। সে-রাত্রে যদি তারা এতটুকুমাত্র নিরুদ্যম হয়ে পড়ত, বারাব্বাসের মতো হাত গুটিয়ে বসে থাকত, তো আর কথা ছিল না। অবশ্য তাহলে সজিব হয়ে দাঁড়াত।

কেন যে বারাব্বাস এমন পালটে গেল, তারা জানে না। এ-পরিবর্তন যেমন আকস্মিক, তেমনই বিস্ময়কর। দলের মধ্যে সে-ই ছিল সবচাইতে সাহসী। কোথায় কবে কি লুঠ করা হবে, কার উপরে আক্রমণ চালানো হবে, বারাব্বাসই তা ঠিক করত—এবং প্রতিবারেই সে সফলকাম হতো। মনে হতো, কোনো কিছুই তার পক্ষে অসাধ্য নয়। তার অদম্য সাহসে, তার অদ্ভুত চাতুর্যে সবাই মুগ্ধ তখন; তারা প্রায় ধরেই নিয়েছিল যে, যা-কিছুতেই সে হাত দিক না কেন, সাফল্য তার অবধারিত। 'সাহস আর বুদ্ধিবলেই সে তাদের নেতা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অথচ মজা এই যে, কেউই তাকে ঠিক পছন্দ করত না। চিরকালই লোকটা একটু খেয়ালী ধরনের, একটু-বা স্বল্পবাক্। দলের আর-পাঁচজনের সঙ্গে তাই ওর ঠিক খাপ খায়নি। তারাও কোনো দিন ওকে বুঝে উঠতে পারত না। বুঝত না, কিন্তু বিশ্বাস করত। বারাব্বাসকে তারা ভালবাসেনি—কিন্তু সম্ভ্রম করেছে, ভয় করেছে। আর এই সম্ভ্রম আর ভয়ের ভিতরেই দৃঢ়মূল একটি বিশ্বাস জন্মলাভ করেছিল যে, যা-কিছুই সে করুক, তাইতেই সে সাফল্যলাভ করবে। যে ছিল সঙ্গীমাত্র, ধীরে ধীরে সে নেতা হয়ে দাঁড়ান।

সেই নেতাই এখন নিরুদ্যম, নেতৃত্বে তার স্পৃহা নেই। চুপচাপ সে গুহামুখে বসে থাকে; জর্ডন উপত্যকার ওপারে মর্মর সমুদ্র,—সেই অলক্ষ্য সমুদ্রের দিকেই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। সে-দৃষ্টি অদ্ভুত, সে-দৃষ্টি অর্থহীন। সে-চোখে চোখ পড়লেও যেন কেমন অস্বস্তি লাগে। বড় একটা কথাও বলে না আজকাল। যদি বা বলে তো তখন তাকে এতই অন্যমনস্ক মনে হয় যে, অস্বস্তিটা তাতে আরো বেড়ে যায় যাত্র। মরতে মরতে লোকটা বেঁচে গিয়েছে, তাই হয়তো এই পরিবর্তন

হয়ে থাকবে। কিন্তু সত্যিই কি ও বেঁচে গিয়েছে? মনে তো হয় না। মনে হয়, যারাই গিয়েছিল; যারা গিয়ে তারপর আবার ফিরে এসেছে।

এসে এখন অস্বস্তি ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। তার এই প্রত্যাবর্তনে কেউ খুশী নয়। যতদিন সে নেতা ছিল, তার মূল্য ছিল। সে-মূল্য তারা দিয়েওছে। সেই নেতৃত্বেই সে এখন বীতস্পৃহ। তার আর কোনো মূল্যও তাই নেই। সে এখন অনাবশ্যক, গলগ্রহ মাত্র।

দুদিন আগেও বারাব্বাস তাদের নেতা ছিল; ছিল অসমসাহসী। লুঠতরাজের নিত্য-নতুন উপায় উদ্ভাবনে তার তুলনা পাওয়া যায়নি। বিনাবাক্যে তারা তখন তার নির্দেশ পালন করেছে। মৃত্যুকে সে তখন তুচ্ছ করে ফিরত। এ-সবই সত্যি। কিন্তু চিরকালই সে কিছু এত সাহসী ছিল না। ইলায়াহু যেদিন তার চোখের নীচে একখানা ছোরা বসিয়ে দিয়েছিল, তার আগে পর্যন্তও ছিল না। সেইদিনের থেকেই সে সাহসী হয়ে উঠেছে।

তার আগে সে ছিল ভীরু, কাপুরুষ। সেই ভীরুতার খোলসের মধ্য থেকেই হঠাৎ একদিন তার পরুষ-সত্তার অভ্যুদয় ঘটল। ইলায়াহু তাকে খুন করতেই চেয়েছিল। সে-চেষ্টা তার সফল হয়নি। সেদিনকার সেই মৃত্যুপণ সংগ্রামে বারাব্বাসই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছিল। ইলায়াহু দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, প্রচণ্ড শক্তিশালী। কিন্তু তারুণ্যের ক্ষিপ্রতার কাছে সে সেদিন পরাভূত হয়েছে। যুদ্ধশেষে তার প্রাণক্লান্ত দেহটিকে দুহাতে কুড়িয়ে নিয়ে বারাব্বাস যখন তাকে এই পাহাড়ের চুড়োর উপর থেকে নীচের দিকে ছুড়ে মারল, শিউরে উঠেছিল সবাই। ইলায়াহু কি জানত না যে, এ যুদ্ধে তার নিজেরই শেষ পর্যন্ত মৃত্যু ঘটবে। জানত যদি তো আগ বাড়িয়ে সে লড়তে গিয়েছিল কেন? তার কারণ আর অন্য কিছুই নয়, বারাব্বাসকে সে ঘৃণা করত,—অসম্ভব ঘৃণা করত। কিন্তু তারই বা কারণ কি? অনেক ভেবেও তারা এর কোনো কারণ খুঁজে পায়নি; সমস্ত ব্যাপারটাই তাদের কাছে একটা রহস্য বলে মনে হয়েছে।

সেদিনকার সেই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই বারাব্বাসের সুপ্ত-সত্তার জাগরণ; সেদিন থেকেই সে তাদের নেতা। তার আগের দিন পর্যন্তও তার মধ্যে কোনো

বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়নি। সে যেন ঘুমিয়ে ছিল; ছুরিকাঘাতের ওই তীব্রতাই তাকে জাগিয়ে দিয়েছে। এ নিয়ে আর তাদের আলোচনার অন্ত ছিল না।

আসল কথাটা কিন্তু তারা জানত না। কেউই জানত না যে, বারাব্বাসের হাতে যার মৃত্যু ঘটেছে, যার সেই শোচনীয় মৃত্যুর কথা এখনো তাদের স্পষ্ট মনে আছে, সেই ইলায়াহুই হলো বারাব্বাসের পিতা। বারাব্বাসের মা ছিল এক মোয়াবাইট নারী। বহুদিন আগে জেরিকোর রাস্তায় এক দস্যুদল তাকে অপহরণ করেছিল। সবাই মিলে তার দেহসম্ভোগের পর জেরুসালেমেরই এক পতিতালয়ে তাকে বিক্রী করে দেওয়া হয়। দুদিন বাদেই বোঝা গেল যে, মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা। বুঝবামাত্র বাড়িওয়ালী তাকে তাড়িয়ে দেয়। মেয়েটি তখন সম্পূর্ণই নিরাশ্রয়। এই নিরাশ্রয় অবস্থায় জেরুসালেমের রাস্তার উপরে তার একটি সন্তান হলো। সন্তানের জন্মদানের খানিক বাদেই মেয়েটির মৃত্যু ঘটে। নবজাতকের পরিচয় পর্যন্ত তাই কেউ জানতে পারেনি। এইটুকু শুধু সবাই বুঝতে পারল যে, ভূমিষ্ঠ হবার আগেই এর উপরে এর মায়ের অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে। স্বর্গ আর মর্ত্য এবং স্বর্গ-মর্ত্যের অধীশ্বরের প্রতি তীব্র ঘৃণাভরেই এর মা এর জন্মদান করেছে।

এই যে রহস্য, এ কেউ জানে না। গুহার ভিতরে বসে ফিসফাস যারা কথা-বার্তা কইছে তারা তো না-ই, বারাব্বাসও না। চুপচাপ সে বসে রয়েছে। মোয়াবের অগ্নিদগ্ধ পর্বতমালার ওপারে যে আদিগন্ত জলরাশি ছড়িয়ে পড়ে আছে, লোকে যাকে বলে মর্মরসাগর, সেইদিকেই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ।

এইখানে এই পর্বতচূড়া থেকেই ইলায়াহুকে সে একদিন নীচে ফেলে দিয়েছিল। অথচ ইলায়াহুর কথাও সে এখন ভাবছে না। সে ভাবছে সেই প্রাণকর্তার মায়ের কথা। ক্রুশবিদ্ধ সন্তানের দিকে তিনি তাকিয়ে ছিলেন। দুই চক্ষু অশ্রুহীন, মুখ দেখে তাঁর দুঃখ বোঝা যায়নি। দুঃখের সেই যন্ত্রণাকে তিনি গোপন করে রেখে-ছিলেন। সবই এখন তার মনে পড়ছে; যাবার আগে ভর্ৎসনাভরা চোখে যে তার দিকে একবার তাকিয়ে গিয়েছিলেন, তা-ও। কত লোকই তো ছিল,—

তাদের দিকে না তাকিয়ে তিনি বারাব্বাসের দিকে তাকাতে গেলেন কেন! তাকালেন যদি, ভর্ৎসনা করলেন কেন?

প্রায়ই এখন তার গল্‌গথার কথা মনে পড়ে! গল্‌গথার কথা, ক্রুশবিদ্ধ সেই মানুষটির কথা, তাঁর মায়ের কথা…

দূরে শৈলশ্রেণীর দিকে তাকিয়ে আছে বারাব্বাস। তার ওপারে মর্মর-সাগর। মোয়াবাইট-ভূমির সেই পাহাড় আর সেই সমুদ্রের উপরে এখন অন্ধকার নেমে আসছে।

সঙ্গীরা প্রায় অধৈর্য হয়ে উঠেছে; বারাব্বাসের হাত থেকে তারা এখন মুক্তি পেলেই বাঁচে। অকর্মণ্য এই গলগ্রহের কাছ থেকে আর তাদের বিন্দুমাত্রও উপকারের আশা নেই। দিবারাত্রি একটা লোক মুখ ভার করে বসে রয়েছে; দেখলেও যেন বিরক্তি লাগে। কোনো কাজেই আর কোনো উৎসাহ পাওয়া যায় না। এমন লোকের যে এখানে কিছুমাত্রও প্রয়োজন নেই, সে এখন বিদায় হলেই যে তারা নিষ্কৃতি পায়, পষ্টাপষ্টিই সেটা এবারে জানিয়ে দেওয়া দরকার। কিন্তু কে যে তাকে গিয়ে জানাবে, সেইটেই এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আড়ালে যে যতোই আস্ফালন করুক, সামনাসামনি কেউ তাকে কিছু বলতে রাজী নয় বারাব্বাসকে তারা ভয় করে, এখনো ভয় করে।

সুতরাং—এক্ষেত্রে যা স্বাভাবিক—গোপনে গোপনেই তাদের শলাপরামর্শ চলতে লাগল। নিজেদের মধ্যে তারা বলাবলি করতে লাগল যে, তারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। বারাব্বাসকে তারা পছন্দ করে না, কখনো করেনি। লুঠতরাজে যে আর আজকাল তেমন সুবিধে হচ্ছে না, দিনকয়েক আগেই যে দলের দু'জন ধরা পড়েছে, এর জন্যেও ওই বারাব্বাসই দায়ী। বারাব্বাস অপয়া। আর এই অপয়া লোক-টাকে যতদিন না তাড়াতে পারা যাচ্ছে, দুর্ভাগ্যের হাত থেকেও ততদিন মুক্তি নেই। চাপা একটা আক্রোশে সবাই হিংস্র হয়ে উঠেছে, চোখে চোখে তাদের

আগুন ঝিকিয়ে উঠেছে। বারাব্বাস তা জানে না। আগের মতোই সে নির্বিকার। দেখে মনে হয়, ধীরে ধীরে সে এক দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তির কাছেই যেন আত্মসমর্পণ করতে চলেছে। অকর্মণ্য, অপয়া পুরুষ। কী করে ওর ওই অশুভ সান্নিধ্যের থেকে এখন মুক্তিলাভ করা যায়।

আর, কী আশ্চর্য, ঘুমের থেকে উঠে একদিন সবাই দেখল যে, বারাব্বাস নেই। নেই! কোথায় গেল সে? প্রথমটা তারা ভেবেছিল, পাগল হয়ে গিয়ে পাহাড়ের চুড়োর থেকে ঝাঁপ দিয়ে সে আত্মহত্যা করেছে; আর নয়তো কারুর অশুভ আত্মা তাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। কে জানে, সে আত্মা হয়তো ইলায়াহুর। আর এইভাবেই সে তার প্রতিশোধ নিয়েছে হয়তো। কিন্তু, তা-ই বা কি করে হয়। তাহলে তার মৃতদেহটা অন্তত খুঁজে পাওয়া যেত। পাহাড়ের নীচে, প্রতিটি ফাটলে আর প্রতিটি গহ্বরে বিস্তর খোঁজাখুঁজি করেও তার মৃতদেহের কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। বারাব্বাস নেই, তার চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

যেখানেই যাক, বারাব্বাস তাদের নিষ্কৃতি দিয়ে গিয়েছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে উপরে উঠে এল সবাই। চতুর্দিক তখন রৌদ্রময়।

বারাব্বাসের ভাগ্যে যে এরপর কী ঘটল তা কেউ জানে না। সে গেলই বা কোথায়, আর বাকী জীবনটা তার কীভাবেই বা কেটেছে, কারুরই সে-সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই। কেউ কেউ বলে, এখান থেকে সে জুডা আর নয়তো সিনাইয়ের মরুভূমিতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল; সেইখানে সেই নিঃসঙ্গ নির্জনতার মধ্যেই তার অবশিষ্ট জীবন জীবরহস্য আর ভগবৎচিন্তায় অতিবাহিত হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলে, বারাব্বাস গিয়ে সামারিটানদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। জেরুসালেমের ধর্মানুষ্ঠান সম্পর্কে এই সামারিটানদের মনে অশ্রদ্ধার আর অন্ত ছিলনা, সেখানকার পুরোহিত-সমাজকেও তারা অত্যন্তই ঘৃণা করত। এখন একথা যারা বলে তাদের ধারণা, ইহুদীদের গৃহ-প্রবেশন উৎসবের দিনে পাহাড়ের

উপরে যে যেষবলির অনুষ্ঠান হয়, বারাব্বাসকে নাকি সেখানে দেখা গিয়েছিল ; যে তখন প্রার্থনার ভঙ্গীতে বসে পেরিজিমে সূর্যোদয়ের জন্যে প্রতীক্ষা করছে। এ ছাড়া আরো একদল লোক আছে ; তারা বলে, এ সব বাজে কথা, বাকী জীবনটা তার লেবানন-উপত্যকার এক দস্যু দলের নেতৃত্ব করে কেটেছে। সবার উপরেই সে সমান অত্যাচার চালাত। ইহুদীই হোক আর খ্রীষ্টানই হোক, কেউই তার হাতে রেহাই পায়নি।

এখন কোনটা যে এর মধ্যে সত্যি তা কেউ জানেনা। এইটুকুই শুধু জানতে পারা গিয়েছে যে, বয়স যখন তার পঞ্চাশোর্ধ্বে, বারাব্বাসকে তখন একবার প্যাফোসের রোমান শাসনকর্তার প্রাসাদে ক্রীতদাস হয়ে আসতে হয়েছিল ; তার আগে বেশ কয়েক বছর তার এক তাম্রখনির মধ্যে অতিবাহিত হয়। তামার খনিতে কাজ করবার মতো এত বড়ো বীভৎস শাস্তি আর নেই। এ শাস্তি তাকে কেন দেওয়া হয়েছিল তা কেউ জানে না। ব্যাপারটা ঈষৎ বিস্ময়জনক। কিন্তু তাম্রখনির সেই নরককুণ্ডের থেকেও যে সে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পেরেছিল, সচরাচর যা কেউ ফিরত না, সেইটেই হলো আরো চমকপ্রদ ব্যাপার। চমকপ্রদ, তবে অকারণ নয়।

বুড়ো হয়ে গিয়েছে বারাব্বাস। শুভ্রকেশ, কুঞ্চিতললাট। স্বাস্থ্য সে-তুলনায় ভালই আছে বলতে হবে। জেরুসালেমে থাকতে শরীর তার সম্পূর্ণই ভেঙে পড়েছিল। ধীরে ধীরে সে ফের সুস্থ হয়ে ওঠে। তারপর তামার খনিতে কাজ করবার সময় সে একরকম মৃত্যুর মুখে গিয়ে পৌঁচেছিল বললেও চলে। সেখান থেকে সে যখন মুক্তিলাভ করল, তাকে আর প্রায় চেনাই যেত না। শরীর তখন তার অস্থিসার ; দুই চক্ষু নিষ্প্রাণ, কোটরগত। মৃত বিবর্ণ সেই চোখ দুটিতে তারপর একটু একটু করে ভাষা ফুটে উঠতে লাগল; দৃষ্টিও অস্থির হয়ে উঠল। তখন যেন তাকে আরো বীভৎস দেখাত। মনে হতো সে ভয় পেয়েছে, ভীষণ ভয় পেয়েছে। কিন্তু শুধু ভয়ই নয়, মাঝে মাঝে সেখানে ঘৃণাও ফুটে উঠত। যে-ঘৃণায় তার মা তাকে জন্মদান করেছিলেন, সেই ঘৃণা। চোখের নীচের সেই কাটা-দাগটি এখন মিলিয়ে এসেছে। সারা মুখ শ্মশ্রুগুম্ফসমাচ্ছন্ন। দাগটিকে আর এখন দেখা যায় না।

বারাব্বাস যে মারা যায়নি, এত অত্যাচারের পরেও যে সে বেঁচে আছে, তার কারণ আর অন্যকিছুই নয়, বারাব্বাসের শরীর একটু শক্ত ধাতুতে গড়া। আরাহ আর সেই মোয়াবাইট নারী—তার বাবা আর মা—দুজনের স্বাস্থ্যই ছিল অসাধারণ মজবুত। বারাব্বাসও তাই জন্মাবধিই বেশ শক্তসমর্থ। আশ্চর্য এই যে, তাদের কাছ থেকে শুধু এই স্বাস্থ্যটাই সে পেয়েছে, ভালবাসা পায়নি। জন্মের পর বাবার কাছ থেকে সে ঘৃণা পেয়েছে, জন্মের আগে মার। পরস্পরকেও তারা কখনো ভালবাসেনি। ভালবাসা! তাদের সেই মিলনের মধ্যে শুধু বিদ্বেষই ছিল, ভালবাসা ছিল না। তা সত্ত্বেও বারাব্বাস তাদের কাছে ঋণী। সে তা জানে না।

যেখানে নিয়ে ঢোকানো হলো বারাব্বাসকে, সেটি হলো গিয়ে ক্রীতদাসদের আস্তানা। তার মধ্যে একজনের নাম শাহাক। জাতে আর্মানী; রোগা আর ঢ্যাঙা! এতই ঢ্যাঙা যে চলাফেরা করবার সময় তাকে একটু কোলকুঁজো দেখায়। চোখ দুটি বড়, বিস্ফারিত। চেহারায় তাতে একটা বৈশিষ্ট্য এসেছে। ছোট ছোট করে ছাঁটা একমাথা পাকা চুল। গায়ের রঙ এককালে ফরসাই ছিল হয়তো, এখন একেবারে জলে গিয়েছে। সব মিলিয়ে বুড়ো-বুড়ো লাগে; আসলে কিন্তু বছর পঁয়তাল্লিশের বেশি বয়েস হয়নি লোকটার। শাহাকও এতদিন তামার খনিতেই ছিল। বারাব্বাস আর সে সেখানে বছরের পর বছর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে একই সঙ্গে কাজ করেছে। চাড়াও পেয়েছে একই সঙ্গে। একটা শুধু তফাৎ রয়েছে। এখনো শাহাক সেই আগের মতোই অক্লিষ্ট। আর তার সেই জরাজীর্ণ স্বাস্থ্য, সেই অকালে বুড়িয়ে-যাওয়া চেহারা, জলে-যাওয়া মুখ, আর বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখ দুটি দেখলে মনে হয় যে, এমন কোনো যন্ত্রণা, এমন কোনো তীব্র অন্তর্জ্বালা তাকে একদিন সহ্য করতে হয়েছে বারাব্বাস এখনো যার আভাসমাত্রও পায়নি। কিংবা শুধু আভাসমাত্রই পেয়েছে। সত্যিই তাই।

তামখনির ক্রীতদাসদের মধ্যে বড় একটা কেউ জীবন্ত অবস্থায় মুক্তিলাভ করেনি। আর তাই বারাব্বাস আর শাহাক যে সেখান

থেকে প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছে, অভ্যাজ্ঞের চোখে সেটা একটু বিস্ময়কর ঠেকতে লাগল। কিছু একটা রহস্য আছে নিশ্চয়ই। রহস্যটা তারা জানতে চায়। জানতে তাদের খুবই আগ্রহ, অথচ অতীত জীবনের সম্পর্কে এরা দুজন একটুই বেশী চাপা যে কিছুই জানতে পারা যাচ্ছে না। বারাব্বাস আর শাহাক,—যদিচ নিজেদের মধ্যেও এরা খুবই কম কথা কয় এবং যদিচ দুজনের চেহারায় পর্যন্ত মিল নেই—পরস্পরের তারা কাছাকাছি থাকে, এক মুহূর্তের জন্যেও কেউ কাউকে ছেড়ে যায় না। মনে হয়, কী-এক অলক্ষ্য বন্ধনে যেন পরস্পরের সঙ্গে তারা বাঁধা পড়ে গিয়েছে। পাশাপাশি কাজ করে, পাশাপাশি খায়, শোয়ও পাশাপাশি। কারণটা আর অন্য কিছুই নয়। তামার খনিতে কাজ করবার সময়ে বারাব্বাস আর শাহাককে সেখানে একই শিকলে জোড় বেঁধে রাখা হয়েছিল। বাইরের বাঁধনটা আর এখন নেই, মনের বাঁধনটা তবু আছে।

পাইপ্রাসের সেই তামার খনিতে ক্রীতদাসদের সব দুজন-দুজন করে জোড় বেঁধে রাখা হত। শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কাজ করতে হ'তো তাদের, কেউ কখনো মুক্তি পেত না। ওঠা-বসা, খাওয়া-শোওয়া সমস্ত ব্যাপারেই তারা একে অন্যের উপরে নির্ভরশীল। আর দিনের পর দিন এইভাবে পাশাপাশি থাকতে থাকতে পরস্পরের নাড়িনক্ষত্র পর্যন্ত তাদের জানা হয়ে যেত। তাদের সেই অন্তরঙ্গতা মাঝে মাঝে তীব্র ঘৃণায় পর্যবসিত হয়েছে। কোনো কারণ না থাকা সত্বেও,—বরং বলা যায় তাদেরকে যে একসঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে শুধুমাত্র এই কারণেই—এক বীভৎস বিদ্বেষে একজন আরেকজনের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার টুঁটি টিপে ধরেছে, এমন দৃশ্য সেখানে প্রায়ই দেখা যেত।

বারাব্বাস আর শাহাকের মধ্যে কিন্তু বেশ মিশ খেয়ে গিয়েছিল। তাম্রখনির বন্দী-জীবনও তাই তাদের কাছে ততো দুঃসহ হয়ে ওঠেনি। কাজ করতে করতেই গল্প করত তারা। বারাব্বাস অবশ্য খুব বেশী কথা কইত না, সে শুধু শুনত। তবে অতীত জীবন নিয়ে প্রথম দিকটায় কেউ কিছু বলেনি। বোঝা যেত যে, দুজনের জীবনেই বেশ খানিকটা রহস্য জড়িয়ে আছে; পরস্পরের কাছে তা তারা খুলে বলতে চায় না। পরে একদিন তা জানা গেল। কথায় কথায় বারাব্বাস

একবার বলেছিল যে সে ইহুদী, তার জন্ম জেরুসালেমে। শুনে শাহাক চমকে উঠল প্রথমটায়। তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জিজ্ঞেস করতে লাগল। নিজে সে কখনো জেরুসালেমে যায়নি; কিন্তু তার কথার ধরনে বোঝা গেল, জেরুসালেমের সম্পর্কে সে অনেক কিছুই খবর রাখে। নানান কথার ফাঁকে হঠাৎ এক সময় সে জিজ্ঞেস করল, জেরুসালেমে সেই যে এক মহামানবের আবির্ভাব হয়েছিল, বারাব্বাস কি তাঁকে চেনে? বারাব্বাস বুঝল, কার কথা সে জিজ্ঞেস করছে। বলল, চেনে। শাহাকের আগ্রহ আর এরপর চাপা রইল না। অথচ সরাসরি তাকে কিছু বলে বসাটাও বারাব্বাসের ইচ্ছে নয়। প্রসঙ্গটাকে এড়িয়ে যাবার জন্যে সে তাই বলল যে, চেনে বটে, তবে ঘনিষ্ঠভাবে তাঁকে কখনো তার জানবার সুযোগ হয়নি। কী বলছে শাহাক, বারাব্বাস কখনো তাঁকে দেখেছে কিনা, এই তো? হ্যাঁ তা দেখেছে বই কি। দেখেছে? শাহাকের প্রথমটায় বিশ্বাসই হতে চায় না। সত্যিই বারাব্বাস দেখেছে তো? অস্ফুট গলায় বারাব্বাস বলল, সত্যিই।

শাহাকের মুখে আর তারপর কথাই সরল না কিছুক্ষণ। গাঁইতিটাকে নামিয়ে রেখে চুপচাপ সে বসে রইল। বারাব্বাসের ওই একটিমাত্র কথায় যেন আজ সমস্ত কিছুই হঠাৎ পাল্টে গিয়েছে। সমস্ত কিছু। এমন কি, তামখনির এই বীভৎস নরককুণ্ডও যেন আজ এক নতুন রূপ, নতুন তাৎপর্য নিয়ে তার কাছে ধরা দিয়েছে। যার সঙ্গে সে আজ এখানে একত্রে শৃঙ্খলাবদ্ধ, স্বয়ং ঈশ্বরকে সে প্রত্যক্ষ করেছে। এত বড় সৌভাগ্যের কথা যেন ভাবাও যায় না।

কতক্ষণ যে শাহাক এইভাবে চিন্তামগ্ন হয়ে বসে থাকত বলা যায় না। তীব্র একটা যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে তার চমক ভাঙল হঠাৎ। ক্রীতদাসদের সর্দার তখন সেইখান দিয়েই যাচ্ছিল, শাহাককে ওইভাবে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে সে তার চাবুক চালিয়েছে। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠে শাহাক আবার তার গাঁইতি তুলে নিল। তাতেও নিস্তার নেই, সপাসপ চাবুক চলতে লাগল। সর্দার সেখান থেকে চলে যাবার পর দেখা গেল যে, সারা পিঠ তার রক্ত-মাখামাখি হয়ে গিয়েছে; সর্বাঙ্গ তার থরথর করে কাঁপছে। কিছুক্ষণ আর সে কোনো কথাই বলতে পারল

না। তারপর একটু সুস্থ হয়ে উঠেই বারাব্বাসকে সে শুধোল, জেরুজালেমের সেই মহামানবের সঙ্গে তার কোথায় সাক্ষাৎ হয়েছিল? মন্দিরে বুঝি? তিনি কি তখন তাঁর রাজ্যপ্রতিষ্ঠার কথা বলছিলেন? না কি অন্য কোনো কথা বলছিলেন তিনি? কিছুক্ষণ চুপ করে রইল বারাব্বাস। তারপর ঈষৎ বিরক্ত গলায় বলল, মন্দিরে নয়, সে তাঁকে গল্‌গথায় দেখেছে।

—গল্‌গথা? সে আবার কোথায়?

বারাব্বাস তাকে বুঝিয়ে বলল যে, অপরাধীদের সেখানে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়।

চোখ নামিয়ে নিল শাহাক। অল্প একটু চুপ করে থেকে তারপর ধীরে ধীরে শান্ত গলায় বলল:

—ও, তখন!

ক্রুশবিদ্ধ লোকটির সম্পর্কে সেই তাদের প্রথম আলাপ। এর পরে প্রায়ই এ নিয়ে তাদের কথাবার্তা হয়েছে।

শাহাকের আর কৌতূহলের সীমা নেই। তাঁর কথা সে আরো জানতে চায়, আরো। কী কী উপদেশ তিনি দিয়ে গিয়েছেন, কোন কোন অসাধ্য সাধন করেছেন, সেই সব শুনতেই তার বেশী আগ্রহ। ক্রুশবিদ্ধ করে যে তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল, শাহাক জানে। সে কথা সে শুনতে চায় না। তার চাইতে বারাব্বাস বরং অন্য কোনো কথা বলুক, তাঁরই সম্পর্কে অন্য কোনো কথা।

গল্‌গথা··গল্‌গথা··এ নাম শাহাক শোনেনি কখনো। অথচ এই গল্‌গথায় যা ঘটে গিয়েছে তা সে জানে। কীভাবে তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করলেন, তাঁর মৃত্যুর মুহূর্তে অলৌকিক কী-সব কাণ্ড ঘটেছিল, বারবার তা সে শুনেছে। পাহাড়টা তখন ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছিল; তাই না? বারাব্বাস তো তার ধারে কাছেই দাঁড়িয়েছিল তখন, সে নিশ্চয়ই দেখেছে?

বারাব্বাস বলল, স্বচক্ষে সে দেখেনি। তবে হ্যাঁ, এই রকমই একটা কিছু ঘটে থাকবে।

—আর যাদের তিনি পুনর্জীবন দান করেছিলেন, ত্রাণকর্তার ক্ষমতা আর মহিমার যারা সাক্ষ্যবহন করছে, তাদের কাউকে দেখেছ?

বারাব্বাস বলল, দেখেছে।

—আর তার মৃত্যুর সময় চতুর্দিক যে অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, তাও দেখেছ?

দেখেছে, তাও বারাব্বাস দেখেছে। সেই নিবিড় নীরন্ধ্র তমিস্রাকেও সে প্রত্যক্ষ করেছে।

শুনে শাহাক খুবই খুশী হলো। তবে হ্যাঁ, অমনভাবে অমন একটা বীভৎস জায়গায় তাঁকে হত্যা করা হলো কেন, এ নিয়ে মনটা একটু খচখচ করছে শুধু। কোথায় যেন একটা কাঁটা বিঁধে রয়েছে, তা সে বুঝতে পারছে না। বিশীর্ণ সেই পাহাড়, সেই ক্রুশ, আর তার উপরে ঈশ্বরপুত্রের মৃতদেহ—এ যেন সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। আমাদের রক্ষা করবার জন্যেই তিনি যন্ত্রণা ভোগ করেছেন; আমাদের বাঁচাবার জন্যেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। শাহাক তা জানে। তবু যেন তার তৃপ্তি হয় না। ঈশ্বরপুত্রের এই মৃত্যুমলিন রূপটি নয়, তার পূর্ণ-মহিম রূপটির কথাই সে ভাবতে ভালবাসে। বারাব্বাস যে তাঁকে বধ্যভূমিতে প্রত্যক্ষ করেছে, শাহাক তাতে খুশী হয়নি। আর সত্যিই তো, এত জায়গা থাকতে ওইখানেই বা বারাব্বাস তাঁকে দেখতে গিয়েছিল কেন?

—আর কোথাও কি তাঁকে দেখতে যেতে পারতে না? ঠিক মৃত্যুর মুহূর্তেই তাঁকে দেখতে গেলে? আশ্চর্য! কী জন্যে গিয়েছিলে, বলো ত?

বারাব্বাস কোনো জবাব দিল না।

কথাপ্রসঙ্গে আরেকদিনও শাহাক তাকে জিজ্ঞেস করে বসল হঠাৎ, অন্য কোথাও কি বারাব্বাস তাঁকে দেখেনি? অল্প একটু চুপ করে থেকে বারাব্বাস বলল, দেখেছে। শাসনকর্তার প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে যেখানে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, সেখানেও সে তাঁকে দেখেছে। যা যা তারপর ঘটেছিল, একে একে বর্ণনা করে গেল বারাব্বাস। তাঁর চারপাশে যে অদ্ভুত একটি আলোকচক্র দেখতে পাওয়া গিয়েছিল, সে-কথাও সে বাদ দিল না। স্পষ্টই বোঝা গেল, শাহাক এ কথায় খুবই খুশী হয়েছে। আর তাই পাছে শাহাক দুঃখিত হয়, আসলে যে সেই আলোকচক্রটা বাস্তব কিছু নয়, বারাব্বাসেরই দৃষ্টিবিভ্রমমাত্র, বারাব্বাস তা চেপে গেল। কী দরকার কাউকে দুঃখ দিয়ে। মিথ্যেটাকেই যদি কেউ সত্যি

জেনে সুখী হয় হোক। সত্যিই শাহাক সুখী হয়েছে। এতই সুখী হয়েছে যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই আলোকচক্রটার কথাই সে বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগল একবার মাত্র শুনে ওর তৃপ্তি হয়নি, বারবার সে এখন সেই একই কথা শুনতে চায়। আনন্দে তার সারামুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। বারাব্বাসের মনেও যেন তার ছোঁয়া লাগল। আনন্দটাকে যেন তারা ভাগাভাগি করে নিয়েছে; দুজনে মিলে উপভোগ করছে।

তারপর কদিন আর অন্য কোনো কথা নেই। অলৌকিক সেই আলোকচক্রের প্রসঙ্গেই তারা মগ্ন হয়ে রইল।

এরই কয়েকদিন বাদে বারাব্বাস তাকে জানাল যে, প্রভুকে সে পুনর্জীবন লাভ করতেও দেখেছে। না না, সমাধির মধ্যে থেকে যে হঠাৎ প্রাণ পেয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, এমন কিছু অবশ্য দেখা যায়নি। সে শুধু দেখেছে যে, আকাশ থেকে অগ্নিবসন এক দেবদূত নেমে এলেন হঠাৎ; হাত দুটি তাঁর সামনের দিকে প্রসারিত, যেন দুটি বর্শাফলক। আর সেই বর্শাফলক এসে তাঁর সমাধির উপরে বিদ্ধ হলো। তারপরেই দেখা গেল যে সমাধি-গহ্বর উন্মুক্ত, শূন্য; মৃতদেহের কোনো চিহ্নপর্যন্ত সেখানে নেই।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো শাহাক শুনে যাচ্ছিল; চোখ দুটি তার বিস্ময়ে বিস্ফারিত। এও কি সম্ভব? এও কি সম্ভব যে, এই হতভাগ্য ক্রীতদাস সেই অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে? তার সাক্ষ্যবহন করছে? কে ও? আসল পরিচয়টা ওর কী? এমন লোকের সঙ্গে যে সে একত্রে শৃঙ্খলাবদ্ধ, শাহাকের মনে হলো, এ তার সৌভাগ্য।

এবং তারও যে একটা গোপন কথা রয়েছে, বারাব্বাসকে তা এবারে জানান দরকার। কোনো কথাই সে আর গোপন রাখবে না। চারদিকে তাকিয়ে শাহাক একবার দেখে নিল, কেউ আসছে কিনা; তারপর ফিসফিস করে বলল যে, তাকে সে একটা আশ্চর্য জিনিস দেখাবে। খনির মধ্যেই একপাশে একটা প্রদীপ জ্বলছিল, বারাব্বাসকে সে টেনে নিয়ে গেল সেইখানে। তারপর সেই অনুজ্জ্বল আলোর নীচে দাঁড়িয়ে নিজের গলার চাকতিখানা

খুলে নিয়ে সে বারাব্বাসের হাতে তুলে দিল। সাধারণ একখানা চাকতি, নতুনত্ব কিছু নেই। প্রত্যেক ক্রীতদাসকেই এই রকমের একখানা চাকতি পরতে হয়, চাকতির উপরে তার মালিকের নাম খোদাই করা থাকে। এখানার উপরে রোমান রাষ্ট্রের ছাপ-মারা, তার কারণ রোমান রাষ্ট্রই তাদের মালিক। কিন্তু চাকতিখানাকে একটু ঘুরিয়ে ধরতেই দেখা গেল যে, তার উল্টোপিঠে অদ্ভুত কতগুলো দাগ কাটা রয়েছে। এ দাগের অর্থ তারা জানে না। শাহাক বলল, নিছক দাগ নয় এগুলো; এ হলো ক্রুশবিদ্ধ সেই মহামানবের নাম। তাদের ত্রাণকর্তার, ঈশ্বরপুত্রের নাম। কিন্তু নামটা যে কী, তা সে জানে না। পড়তে জানে না শাহাক, বারাব্বাসও না। তা সত্ত্বেও বিস্ময়বিমূঢ়ের মতো বারাব্বাস সেদিকে তাকিয়ে রইল। কী এক যাদুমন্ত্রে যেন সে হঠাৎ অভিভূত হয়ে পড়েছে। শাহাক বলল, নাম খোদাইয়ের তাৎপর্য আর অন্য কিছুই নয়; ঈশ্বরপুত্রই তার মালিক। বারাব্বাস সে কথা শুনল কি শুনল না। ধীরে ধীরে সে সেই চাকতিখানাকে আবার হাতে তুলে নিল; নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কার যেন পায়ের শব্দ। সর্দার আসছে না তো? না। কেউ না। নিশ্চিন্ত হয়ে তারা চোখ ফিরিয়ে নিল। গায়ে গা ঠেকিয়ে তারা দাঁড়িয়ে আছে। চাকতির উপরকার অদ্ভুত সেই আঁকিবুকির দিকে তাকিয়ে আছে। তারপর চারপাশে একবার দেখে নিয়ে একটু নিচু গলায় শাহাক একসময় বলল যে, এক গ্রীক ক্রীতদাস তার চাকতির উপরে এই নাম খোদাই করে দিয়েছে; সে ছিল খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাসী। ত্রাণকর্তার কথা শাহাক আগে কিছুই জানত না; এই গ্রীক ক্রীতদাসের কাছেই সে সব শুনেছে। সে-ই তাকে বলেছিল যে, শীগগীরই এই পৃথিবীতে তিনি তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন; সে-ই শাহাককে বিশ্বাস করতে শিখিয়েছিল। শাহাক আগে ধাতুপিণ্ড গলানোর চুল্লীতে কাজ করত, সেইখানেই আলাপ হয়েছিল তাদের। চুল্লীতে কাজ করতে গিয়ে বছর খানেকের বেশী কেউ বাঁচে না, অত গরমে বাঁচতে পারে না কেউ। তার অবশ্য এক বছরও পূর্ণ হয়নি। তার আগেই মারা গেল লোকটা। মৃত্যুর মুহূর্তে সে শুধু একটি কথাই বলতে পেরেছিল, "প্রভু, আমাকে পরিত্যাগ করো না।" শাহাকের তা এখনো

স্পষ্ট মনে আছে। মৃত্যুর পরে সহজেই যাতে শিকলটাকে খুলে নেওয়া যায় পা দুখানা কেটে ফেলা হয়েছিল তার। তারপর তার মৃতদেহটাকে নিয়ে অন্য চুল্লীর মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। এ সব ক্ষেত্রে তাই করা হয়। শাহাক ভেবেছিল, সেও একদিন ঠিক এইভাবেই মারা যাবে। কিন্তু না, কিছুদিন বাদেই তামার খনিতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো তাকে। এখানে তখন লোকের দরকার পড়েছিল।

কথা শেষ করে স্থিরদৃষ্টিতে সে বারাব্বাসের দিকে তাকিয়ে রইল। বারাব্বাস বুঝল, শাহাকও খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। তাই বোধ হয় সে তখন বলছিল যে, একমাত্র ঈশ্বরই তার মালিক।

দিন কয়েক একেবারে চুপ করে রইল বারাব্বাস। তারপর একদিন বাধো-বাধো অস্ফুট গলায় শাহাককে সে জিজ্ঞেস করল, তার চাকতিখানাতেও কি ওইভাবে তাঁর নাম খোদাই করিয়ে নেওয়া যায় না? •লিখে দেবে শাহাক?

শুনে শাহাক খুবই খুশী হলো। নিশ্চয়ই সে লিখে দেবে। সে অবশ্য হরফ চেনে না। কিন্তু তাতে কি। নিজের চাকতিখানা দেখে দেখে বারাব্বাসের চাকতিতেও সে ঠিক একটা নকল তুলে দেবে।

সর্দার কাছেপিঠেই ঘোরাঘুরি করছিল। তখন আর তাই কোনো কথাবার্তা হলো না। তারপর খানিক বাদে সে একটু দূরে সরে যেতেই ধারালো এক পাথর কুড়িয়ে নিল শাহাক; প্রদীপের নীচে দাঁড়িয়ে নিজের চাকতি দেখে দেখে বারাব্বাসের চাকতির উপরে সে দাগ কাটতে শুরু করল। রীতিমত কঠিন কাজ। একে তো তার হাত মোটেই দক্ষ নয়, তার উপরে আবার ভয় রয়েছে, কেউ না দেখে ফেলে। তা সত্ত্বেও যতদূর সম্ভব তার চেষ্টার কোনো ত্রুটি হলো না। আর সত্যি বলতে কি, বাধাবিঘ্নও তো কম নয়। এক একবার পায়ের শব্দ শোনা যায়, আর তারা চাকতি দুটোকে লুকিয়ে ফেলে। এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ ধরে দাগ কাটার পর কাজ শেষ হলো শাহাকের। দেখা গেল, তার চাকতি আর বারাব্বাসের চাকতির দাগগুলোকে ঠিক একই রকম লাগছে। নকলটা বেশ ভালই হয়েছে। যে যার নিজের চাকতির আঁকিবুকি টানা দুর্বোধ্য

হরফগুলির দিকে তাকিয়ে রইল। হরফগুলোকে তারা চেনে না; কিন্তু জানে যে এগুলো শুধু হরফমাত্রই নয়, একজনের নাম। যাঁর নাম, সেই মহামানব তাদের প্রভু; তিনি ত্রাণকর্তা, নিপীড়িতের ঈশ্বর। আর একথা মনে হবামাত্রই নতজানু হয়ে তারা প্রার্থনায় বসল।

দূরে থেকে যে সর্দার তাদের লক্ষ্য করেছে, চাবুক হাতে ছুটে এসেছে, তা তারা জানেও না। যখন জানল, চাবুকে চাবুকে দুজনের পিঠেই তখন রক্তস্রোত বইছে। যন্ত্রণায় শাহাক প্রায় মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল; আরো কয়েক ঘা চাবুক মেরে তাকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো। গায়ে গায়ে ঠেশ দিয়ে কোনো রকমে দাঁড়িয়ে রইল তারা, সেই অবস্থাতেই ফের কাজ আরম্ভ করল।

বারাব্বাসের পরিবর্তে যিনি মৃত্যুবরণ করেছেন, ক্রুশবিদ্ধ রুগ্নতনু সেই নীরোমবক্ষ মানুষটির জন্যে এই প্রথম যন্ত্রণা ভোগ করল বারাব্বাস। এর আগে আর কখনো করেনি।

দিনে দিনে মাস, মাসে মাসে বছর। বছরের পর বছর কাটতে লাগল। কখন যে সূর্য ওঠে, কখন অস্ত যায়, তারা জানে না! শুধু একটানা অনেকক্ষণ কাজ করবার পর যখন তারা শ্রান্ত হয়ে পড়ে, হাত যখন আর চলে না, দলে দলে তাদের সবাইকে তখন ঘুমোতে নিয়ে যাওয়া হয়। আর তখন তারা বুঝতে পারে যে, রাত্রি হয়েছে। খনির থেকে তাদের বাইরে যেতে দেওয়া হয় না, এক মুহূর্তের জন্যেও না। সেইখানে সেই মৃত্যুহিম ভূগর্ভের আধো-অন্ধকারে প্রদীপের অস্পষ্ট আলোর নীচে দাঁড়িয়ে রক্তহীন প্রেতমূর্তির মতই তারা কাজ করে যায়। সমস্ত আলো, সমস্ত জীবন যেন এক মৃত্যুময় সমুদ্রের মধ্যে এসে নিমজ্জিত হয়েছে। খনিমুখের সুড়ঙ্গপথে শুধু অল্প একটু আলো এসে পড়ে, এক-চিলতে আকাশ দেখা যায়। বাইরের পৃথিবীর আর কোনো কিছুই তাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। সমস্ত কিছুই যেন বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। আর সেই সুড়ঙ্গপথেই নোংরা ঝুড়িতে করে

তাদের জন্যে খাবার নামিয়ে দেওয়া হয়। ঝুড়ির উপরে সবাই গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। ক্ষুধার্ত পশুর সঙ্গে এই মানুষগুলির আর এখন বিন্দুমাত্রও পার্থক্য নেই।

দিন কয়েক হলো, শাহাক বড় বিষণ্ণ হয়ে রয়েছে। তার কারণ, বারাব্বাস আর তার সঙ্গে প্রার্থনা করতে বসে না। চাকতির উপরে ত্রাণকর্তার নাম খোদাই করিয়ে নেবার পর এক-আধবার সে প্রার্থনা করেছিল, তারপরে আর করেনি। এমনিতেই বারাব্বাস কম কথা বলে, আজকাল যেন আরও গম্ভীর হয়ে গিয়েছে। সব কিছুই একটা দুর্বোধ্য হেঁয়ালির মত লাগে, বুঝতে পারা যায় না। এ একটা অদ্ভুত রহস্য। অনেক ভেবেও শাহাক এর কোনো কূলকিনারা পায়নি। সে নিজে এখনও আগের মতো প্রার্থনা করতে বসে। বারাব্বাস তখন সেদিকে তাকায়না পর্যন্ত। নিজে তো প্রার্থনা করেই না, দেখতেও তার আপত্তি। তবে শাহাককে সে তখন আড়াল করে দাঁড়িয়ে থাকে, যেন না তার প্রার্থনায় কোনো ব্যাঘাত ঘটে। মনে হয়, শাহাকের প্রার্থনানুষ্ঠানে সে সাহায্য করতে চাইছে। নিজে কিন্তু প্রার্থনা করে না।

কেন? এর কারণ কি? শাহাক জানে না। বারাব্বাসকে তার দুর্বোধ্য লাগে, তার আচরণকে ততোধিক। মাটির নীচের এই বন্দী-জীবনে এই নির্যাতনের মধ্যে, এই নিরবচ্ছিন্ন সান্নিধ্যের ভিতর দিয়ে শাহাকের মনে হয়েছিল, বারাব্বাসকে সে চেনে। বিশেষ করে এক-একবার যখন তারা একত্র-প্রার্থনায় বসেছে, শাহাকের মনে হয়েছিল, চেনার বোধ হয় আর কিছুই বাকি নেই। আজ বুঝল বারাব্বাসকে সে চেনে না। প্রতি মুহূর্তের এই সান্নিধ্য সত্ত্বেও সে তার কাছে অপরিচিতই রয়ে গিয়েছে। তার এই দিবারাত্রির সঙ্গীর জীবনে এমন একটা দিক রয়েছে, এমন একটা রহস্য, যা এখনও তার কাছে উন্মোচিত হয়নি।

কী ওর পরিচয়?

এখনও তারা কথাবার্তা কয়, কিন্তু আগেকার সেই আন্তরিকতা আর ফুটে ওঠে না। কথা কইবার সময় শাহাকের দিকে সে তাকায় না পর্যন্ত, তার চোখ দুটি পর্যন্ত শাহাকের দৃষ্টিগোচর হয় না। কখনোই কি হয়েছিল? মনে করে দেখবার চেষ্টা করল শাহাক, কখনোই কি হয়েছিল?

এ কার সঙ্গে তাকে একত্রে বেঁধে রাখা হয়েছে ?

অলৌকিক যে-সব দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছিল বারাব্বাস, তা নিয়ে আর তারপর কখনো কথাবার্তা হয়নি। বারাব্বাস বলেনি। শাহাক কিন্তু তার সেই আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা শুনতে চায়। অথচ এমনই দুর্ভাগ্য, শুনবার আর উপায় নেই। সবই তাই তার শূন্য বলে মনে হতে লাগল। বারাব্বাসের মুখে শোনা ঘটনাগুলিকে মাঝে মাঝে সে স্মরণ করবার চেষ্টা করে। মনশ্চক্ষে সেই ঘটনাগুলিকে সে একবার প্রত্যক্ষ করতে চায়। কিন্তু তা অত সহজ নয়। চোখের সামনে যে একটা অস্পষ্ট ছবি ভেসে ওঠে, শোনা-কথার সঙ্গে তার কোনো মিল থাকে না। কেমন করেই বা থাকবে ? ভালবাসার দেবতাকে, ঈশ্বরকে, তো আর সে স্বচক্ষে দেখেনি। তাঁর আলোকচক্রের আভায় তো আর তার দুই চক্ষু উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেনি। কেমন করে তাই মিল থাকবে।

যে আশ্চর্য দৃশ্য সে একদিন দেখেছিল, বারাব্বাসের চোখ দিয়েই দেখেছিল। তার স্মৃতিই এখন তার একমাত্র সম্বল। একমাত্র সান্ত্বনা।

প্রভুকে তার নরক-যন্ত্রণার থেকে মুক্ত করবার জন্যে অগ্নিবসন এক দেবদূত নেমে আসছে; ঈষ্টার-প্রভাতের এই অপূর্বসুন্দর দৃশ্যটির কথা ভাবতেই শাহাকের সবচাইতে ভাল লাগে। আশ্চর্য সেই ছবিখানি তার মনশ্চক্ষুর সামনে এসে ভেসে ওঠে। প্রভু যে তার মৃত্যুর থেকে মুক্ত হয়েছেন, পুনর্জীবন লাভ করেছেন, তা নিয়ে আর তার এতটুকুও সন্দেহ নেই। আবারও তিনি আসবেন, তাঁর প্রতিশ্রুতিমত এই পৃথিবীর উপরে তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন। এ যে ঘটবেই, শাহাক দৃঢ়-নিশ্চিত। আর তারা, তাম্রখনির এই নারকীয় বীভৎসতার মধ্যে প্রতিনিয়ত যাদের মৃত্যু-যন্ত্রণা সহ্য করতে হচ্ছে, তারাও মুক্তি পাবে। খনিমুখে এসে তিনি দাঁড়াবেন। প্রত্যেকটি ক্রীতদাসকে কাছে টেনে নিয়ে তার শৃঙ্খল-মোচন করবেন। প্রভুর রাজ্যে গিয়ে তারা প্রবেশ করবে তারপর।

শাহাকের সমস্ত হৃদয়ে এখন সেই তীব্র প্রত্যাশা ছড়িয়ে গিয়েছে। প্রতিদিন যখন তারা সার বেঁধে গিয়ে খেতে দাঁড়ায়, সুড়ঙ্গপথে যখন ঝুড়িবোঝাই খাবার নেমে আসে, ব্যাকুলভাবে সে খনিমুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। উপরে খনির বাইরে

অলৌকিক সেই পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে কিনা বুঝতে চেষ্টা করে। কিন্তু না, বাইরের জগতের কোনো কিছুই এখান থেকে দেখা যায় না। পরিবর্তন যদি কিছু ঘটেও থাকে, তা বুঝবার পর্যন্ত উপায় নেই। কত কিছুই হয়তো ঘটে গিয়েছে এর মধ্যে। তারা জানে না পর্যন্ত। কিন্তু তা-ই বা কী করে হয়? সত্যিই যদি তিনি তাঁর রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করে থাকেন, সত্যিই যদি তাঁর পুনরাবির্ভাব হয়ে থাকে, তারাও তা হলে মুক্তি পেত। এই যে তারা নরকযন্ত্রণা সহ্য করছে, এ কি তিনি ভুলে থাকতে পারেন? পারেন না।

শাহাক একদিন তার দৈনন্দিন প্রার্থনায় বসেছে, এমন সময় অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটল। কয়েকদিন আগেই তাম্রখনির সর্দার-বদলি হয়ে গিয়েছে। নতুন যে লোকটা সর্দার হয়ে এসেছে, পিছন থেকে ধীরে-ধীরে সে শাহাকের সামনে এসে দাঁড়াল। শাহাক তাকে দেখতে পায়নি, তার পায়ের শব্দও শুনতে পায়নি। বারাব্বাস শাহাকের ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। খনির সেই আধো-অন্ধকারে সর্দারকে এসে দাঁড়াতে দেখবামাত্রই তাড়াতাড়ি নিচু গলায় শাহাককে সে সাবধান করে দিল। তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল শাহাক, যেন-কিছুই-হয়নি এমনি একটা ভাব দেখিয়ে ফের গাঁইতি চালাতে লাগল। তবে সে বুঝতে পেরেছিল, কোনো কিছুই সর্দারের চোখ এড়ায়নি; আর তাই প্রতিমুহূর্তেই আশঙ্কা করছিল যে, এখুনি তার পিঠের উপরে এসে চাবুক আছড়ে পড়বে। অথচ তার কোনো কিছুই ঘটল না। সর্দার শুধু থেমে দাঁড়াল একবার। তারপর ধীরে ধীরে, কী আশ্চর্য, স্নেহস্নিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করল, সে অমন হাঁটু মুড়ে বসেছিল কেন? আপন মনে অমন বিড়বিড় করছিল কেন সে? শাহাক লুকোল না। ভয়ত্রস্ত ভাঙা-ভাঙা গলায় বলল যে, সে তার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছিল।

—ঈশ্বর! কে তোমার ঈশ্বর?

সব কথাই তখন খুলে বলল শাহাক। শুনতে শুনতে আপন মনেই সর্দার মাথা দোলাতে লাগল। যেন সে এটা আগেই খানিকটা আঁচ করতে পেরেছিল। ক্রুশবিদ্ধ ত্রাণকর্তার সম্পর্কে দু-একটা প্রশ্নও করল সে। এর আগেও সে এই ত্রাণকর্তার কথা শুনেছে, এ নিয়ে চিন্তা করেছে। কিন্তু এ কি সত্যি যে, তিনি

স্বেচ্ছায় ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন? বীভৎস নরকযন্ত্রণাকেও তিনি স্বেচ্ছাতেই বরণ করে নিয়েছিলেন? আর এরপরেও সবাই তাঁকে ঈশ্বর মনে করে? এরপরেও তিনি দেবতার আসন পেয়েছেন? অদ্ভুত, তারি অদ্ভুত!...আর, তাঁকে সবাই ত্রাণকর্তাই বা বলে কেন? ত্রাণকর্তা!...কথাটার মানে কি? তিনি কি আমাদের ত্রাণ করবেন? আমাদের আত্মাকে তিনি রক্ষা করবেন? কেন, তা কেন করতে যাবেন তিনি? ..আশ্চর্য!

শাহাক তাকে সাধ্যমত সব বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করল। ধৈর্যভরেই সব শুনল সে; কিন্তু তার মুখ দেখেই বোঝা গেল, যে-প্রশ্ন তার হৃদয়ে জেগেছে, মূর্খ এই ক্রীতদাসের অসংলগ্ন বিশ্লেষণে তা এখনও পরিতৃপ্ত হয়নি। কথার ফাঁকে ফাঁকে সে তার মাথা দুলিয়ে চলেছে; আর এতই আগ্রহভরে সব শুনে যাচ্ছে যে মনে হয়, উত্তরটা না-জানা পর্যন্ত তার তৃপ্তি নেই। সব কথা শেষ হবার পর সে বলল, দেবতা মাত্র একজন নয়, দেবতা অনেক। কে যে কখন ক্রুদ্ধ হয়ে বসে, তার কোনো ঠিক নেই। দুটো-একটা পশুবলি দিয়ে সবাইকেই তাই তুষ্ট রাখা ভাল।

শুনে শাহাক বলল, তার যিনি দেবতা, তিনি অন্য কোনো বলির প্রত্যাশী নন। তিনি চান সবাই আত্মবলি দিক!

—আত্মবলি! এ তুমি বলছ কী? আত্মবলি?

—হ্যাঁ, তাই। যন্ত্রণার যে বিরাট অগ্নিকুণ্ড তিনি জ্বালিয়ে রেখেছেন, তিনি চান যে, তারই মধ্যে এসে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ুক, পরিশুদ্ধ হোক্।

—যন্ত্রণার অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে! সর্দার তার মাথা নাড়িয়ে বলল, তুমি একজন সামান্য ক্রীতদাস। এ যা বললে এ শুধু তোমার মুখেই সাজে। কী অদ্ভুত সব কথা! যন্ত্রণার অগ্নিকুণ্ড! এ তুমি পেলে কোথায়?

শাহাক বলল:

—এক গ্রীক ক্রীতদাসের কাছ থেকে। প্রায়ই সে এসব বলত! কিন্তু এর মানে যে ঠিক কী, তা আমি নিজেও জানি না।

—সে তো বুঝতেই পারছি। আর শুধু তুমি বলেই নও, কেউই জানেনা। আত্মবলি...যন্ত্রণার অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে...যন্ত্রণার অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে...

শেষের দিকে তার কথাগুলি এত অস্পষ্ট হয়ে এল যে তা বোঝা গেল না। বিড়বিড় করতে করতেই সে এগোতে লাগল। প্রদীপের নীচে অল্প একটু আলো, তারপর দু' পা এগিয়েই অন্ধকার। অন্ধকারে আর তাকে দেখা গেলনা।

সমস্ত ব্যাপারটাই এত বিস্ময়কর যে, শাহাক আর বারাব্বাস দুজনেই ততক্ষণে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছে। এমনটা যে হবে, তা তারা ভাবতেও পারেনি। কিছুই তাদের বোধগম্য হলো না। এ লোক এখানে এল কি করে। সত্যিই লোকটা সর্দার তো? বিশ্বাস হয়না। তা হলে কি আর ক্রুশবিদ্ধ সেই ত্রাণকর্তাকে নিয়ে এত মাথা ঘামাত। কিন্তু অবিশ্বাসই বা করে কি করে। সে যাই হোক, যা হয়েছে ভালই হয়েছে।

লোকটা এরপর ঘনঘন আসতে লাগল। যেতে আসতে দুদণ্ড একটু থেমে দাঁড়ায়, দু-চারটে কথা বলে শাহাকের সঙ্গে, তারপর আবার চলে যায়। বারাব্বাসের সঙ্গে কিন্তু সে কথা কয়না, কখনও কয়নি। শাহাককে সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব প্রশ্ন করেছে; শাহাকও তার সাধ্যমত সব জানিয়েছে তাকে। প্রভুর কথা, তাঁর সেই পরস্পরকে ভালবাসার কথা, কোনো কিছুই সে বাদ দেয়নি। সর্দার সব শুনল। শুনে তারপর একদিন বলল:

—আমিও তাঁকে বিশ্বাস করবার কথা ভাবছি। কিন্তু কী করে আমি বিশ্বাস করব বলো, একি বিশ্বাসযোগ্য? আর তা-ছাড়া ক্রীতদাসদের আমি সর্দার। সামান্য একজন ক্রীতদাসের মতো যাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে, সর্দার হয়ে কি আমি তাঁর উপাসনা করতে পারি?

শাহাক বলল:

—ক্রীতদাসের মতই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন সত্যি, কিন্তু তাতেও তাঁর মহিমা কিছু খর্ব হয়নি। তা সত্ত্বেও তিনি ঈশ্বর। একমাত্র ঈশ্বর। একবার যে তাঁকে বিশ্বাস করেছে, অন্য আর কাউকেই সে তার ঈশ্বর বলে মেনে নিতে পারেনা।

—একমাত্র ঈশ্বর! আর তিনি কিনা ক্রীতদাসের মতো ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন! কী আশ্চর্য, এ-ও কি সম্ভব? এ-ও কি কখনো সত্যি হতে পারে?

শাহাক বলল :

—হ্যাঁ, এ-ই সত্যি।

লোকটা তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর অভ্যাসমতো মাথা নাড়তে নাড়তে চলে গেল। দু-চার মুহূর্ত আর তাকে দেখা গেল না।

শাহাক আর বারাব্বাস, স্থিরদৃষ্টিতে দুজনে চেয়ে রইল তার দিকে। একটু এগিয়ে আর-একটা প্রদীপ। সেইখানে গিয়ে পৌঁছুতেই ম্লান আলোকে তার অস্পষ্ট চেহারাটা মুহূর্তের জন্যে একবার ভেসে উঠল। তারপরে আবার অন্ধকার।

সর্দারও এখন এই অপরিচিত, অপরিজ্ঞাত ঈশ্বরের কথা ভাবতে শুরু করেছে। কিন্তু যতই সে তাঁর কথা শুনছে, ততই যেন তার গোলমাল হয়ে যাচ্ছে সবকিছু। ততই যেন সব রহস্যময় হয়ে উঠেছে। সত্যিই কি তিনি অদ্বিতীয়? একমাত্র ঈশ্বর? তা-ই যদি হয়? তাহলে তো একমাত্র তাঁরই উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানানো উচিত, অন্য আর কারুর উদ্দেশ্যেই নয়। স্বর্গ এবং মর্ত্যের তিনি একমাত্র অধীশ্বর; সর্বত্রই তিনি তাঁর নির্দেশ পাঠিয়ে দিয়েছেন। ভূগর্ভের এই অন্ধকারেও। আর সেই নির্দেশবাণীও তাঁর এতই অসাধারণ যে, তার তাৎপর্য পর্যন্ত কারুর বুঝবার উপায় নেই। "পরস্পরকে ভালবাসো···পরস্পরকে ভালবাসো"···নাঃ, কে এ-কথার মানে বুঝবে!···

দুই প্রদীপের মধ্যবর্তী জায়গাটা অন্ধকার। সেই অন্ধকারে সে একবার থেমে দাঁড়াল। কথাটা একটু ভেবে দেখতে হবে। আর তৎক্ষণাৎ, সেই নিস্তব্ধ নির্জন অন্ধকারে, যেন কোন এক অমোঘ অন্তরাত্মার নির্দেশে সে তার কর্তব্য স্থির করে ফেলল। তাম্রখনির এই মৃত্যুহিম যন্ত্রণা, শাহাককে এর থেকে মুক্তিদান করতে হবে। এখানে থাকলে ও বাঁচবেনা। এখান থেকে ওকে অন্য কোথাও, অন্য কোনো কাজে পাঠিয়ে দেবে সে; এমন কোনো জায়গায়, যেখানে ও আর-কিছু না হোক—সূর্যের মুখ অন্তত দেখতে পায়। শাহাকের সেই অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে সে জানে না, বোঝে না। বোঝা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু তাতে কি। শাহাককে সে মুক্তিদান করবে। এ তার ঈশ্বরের নির্দেশ।

তাম্রখনির কাছেই আর একদল ক্রীতদাসকে দিয়ে খামারের কাজ করানো হয়। সর্দার একদিন সেখানে গিয়ে তাদের কর্তার সঙ্গে দেখা করল। লোকটা একটু সাদাসিধে প্রকৃতির, চেহারার মধ্যেও চাষীসুলভ খানিকটা বলিষ্ঠ সারল্য মাখানো। সর্দার তাকে গিয়ে বলল যে, খনির থেকে একজন ক্রীতদাসকে সে খামারে পাঠিয়ে দিতে চায়, এখন থেকে সে খামারেই কাজ করবে। লোকটা তাতে রাজী হলোনা প্রথমটায়। বলল যে, খনির ক্রীতদাস দিয়ে তার কাজ চলবে না। লোকের অবশ্য তার দরকার রয়েছে। বিশেষ এখন লাঙল দেবার সময়। মাঠে মাঠে হল চালাতে হবে। তার জন্যে বলদ দরকার। এদিকে আবার বলদের খুব অভাব। তাই ক'জন লোক নইলে আর চলছে না। তা বলে সে খনির লোক চায় না। একেতো তারা হাড্ডিসার, তার উপরে আবার বাইরের লোকদের সঙ্গে তাদের ঠিক খাপ খায়না। আরও সব নানান রকমের ওজর আপত্তি দেখিয়েছিল সে, কিন্তু তাতে কোনো লাভ হলো না। সর্দারের কথাই শেষ পর্যন্ত তাকে মেনে নিতে হলো। ঠিক হলো যে, শাহাক এখন থেকে খামারে কাজ করবে। কথাবার্তা ঠিক করে সর্দার খনিতে ফিরে এল।

পরের দিন সে বহুক্ষণ ধরে শাহাকের সঙ্গে কথাবার্তা কইল। ক্রুশবিদ্ধ সেই ত্রাণকর্তার সম্পর্কে আগে আর কখনো তাদের মধ্যে এত দীর্ঘ আলোচনা হয়নি। কথাবার্তা শেষ হবার পর বিদায় নেবার পূর্বমুহূর্তে সর্দার তাকে জানাল যে, তাম্রখনির এই বীভৎস যন্ত্রণার থেকে সে তাকে মুক্তি দেবার ব্যবস্থা করেছে। এখন থেকে তাকে খামারে কাজ করতে হবে। খনিমুখে যে একজন প্রহরী মোতায়েন রয়েছে, শাহাক তার কাছে গেলেই সে তার শৃঙ্খলমোচন করে দেবে। ব্যারাকবাসের থেকে আলাদা করে নিয়ে শাহাককে তারপর খামারে পৌঁছে দেবে সে। এখন থেকে শাহাক সেইখানেই কাজ করবে।

আনন্দে আর বিস্ময়ে শাহাক কিছুক্ষণ একেবারে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বীভৎস এই যন্ত্রণার থেকে তাকে মুক্তি দেওয়া হবে। এত সৌভাগ্য! এ-যেন বিশ্বাস হতে চায়না। সত্যিই তাকে মুক্তি দেওয়া হবে তো? সর্দার বলল,

সত্যিই। শাহাকের যিনি ঈশ্বর, তাঁরই নির্দেশে সে তাকে মুক্তিদান করছে। তাঁর ইচ্ছাই তিনি তাকে দিয়ে পূর্ণ করিয়ে নিলেন।

শীর্ণ বুকের উপরে হাত দু'খানিকে জড়ো করে এনে এক-মুহূর্ত চুপ করে রইল শাহাক; তারপরে ধীরে ধীরে প্রায়-অস্ফুট কণ্ঠে বলল যে, বারাব্বাসের কাছ থেকে সে পৃথক হতে চায়না। তাকে যদি মুক্তি দেওয়া হয়, তবু না। বারাব্বাসকে ছেড়ে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। তার কারণ সে আর বারাব্বাস দুজনেই সেই একই ঈশ্বরে বিশ্বাসী।

সর্দারের আর বিস্ময়ের অবধি রইল না। সপ্রশ্ন বিস্ময়ে বলল:

—একই ঈশ্বরে বিশ্বাসী। কই, ও তো তোমার মতো প্রার্থনা করে না?

শাহাক বলল:

—না, তা অবশ্য করে না। কিন্তু তাতে কি। প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমি যাকে সর্বক্ষণ কাছে পেতে চাইছি, প্রার্থনা না-করেও ও তাকে পেয়েছে। আর-একভাবে পেয়েছে। ক্রুশবিদ্ধ হয়ে তিনি যখন মৃত্যুবরণ করেন, ও তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। তাঁর মাথার উপরকার অলৌকিক আলোকচক্রটিকেও ও প্রত্যক্ষ করেছে। স্বর্গের থেকে অগ্নিবসন একজন দেবদূত নেমে এসে যে তাঁকে পুনর্জীবন দিয়েছে, তাও দেখেছে। তিনি যে কতো বড়, কতো মহান, এ আমি ওরই কাছে জেনেছি।

সর্দার যেন একটু বিব্রত বোধ করতে লাগল। অতশত সে জানত না। বারাব্বাসের হাবভাব তার কখনো খুব ভাল লাগেনি। বীভৎসদর্শন এই ক্রীতদাস, চোখের নীচে যার অত বড় একটা ক্ষতচিহ্ন, সরাসরি কারুর দিকে তাকাবার পর্যন্ত যার সাহস নেই, সে কিনা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেছে! শাহাক আর ওর ঈশ্বর কি এক, অভিন্ন? না, এ যেন বিশ্বাসযোগ্য নয়।

বারাব্বাসকে তার মুক্তি দেবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু শাহাকের সেই এক কথা:

—ওকে ছেড়ে আমি মুক্তি চাইনা।

আপনমনেই সর্দার খানিকক্ষণ বিড়বিড় করতে লাগল। অপাঙ্গে এক একবার

দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে লাগল বারাব্বাসের দিকে। না, এ-লোকটাকে তার মুক্তি দেবার ইচ্ছে নেই। কিন্তু তাতে কি হয়, অনিচ্ছাসত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তাকে শাহাকের অনুরোধই মেনে নিতে হলো। দু'জনকেই তাদের মুক্তি দেওয়া হবে।

খনিমুখে যে একজন প্রহরী মোতায়েন ছিল, শাহাক আর বারাব্বাস যথাসময়ে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সে তাদের শৃঙ্খলমোচন করে দিল। ভূগর্ভের সেই অন্ধ তমিস্রার থেকে বেরিয়ে এল তারা। বাইরের পৃথিবী তখন সূর্যালোকে উদ্ভাসিত। মার্ট্‌ল্ আর ল্যাভেণ্ডারের প্রসন্ন সৌরভে চারদিক ভরে উঠেছে। পাহাড়ের নীচে সুবিস্তীর্ণ শস্যভূমি। কোন অলৌকিক শিল্পী যেন তার উপরে গাঢ়-সবুজ একখানি চাদর বিছিয়ে দিয়েছে। একটু দূরেই সমুদ্র।

শাহাক হঠাৎ বসে পড়ল সেইখানে। আনন্দাবেগে চিৎকার করে উঠল:

—তিনি এসেছেন! তিনি এসেছেন! এই তো তাঁর রাজ্য!

যে প্রহরীটি তাদের এগিয়ে নিতে এসেছিল, ব্যাপার দেখে আর তার বিস্ময়ের সীমা রইল না। তারপর সে তার পা' দিয়ে শাহাকের গায়ে একটা ঠোকর মেরে বলল:

—খুব হয়েছে, এবারে এগোও দেখি।

দীর্ঘদিন একসঙ্গে বাঁধা থাকতে থাকতে শাহাক আর বারাব্বাসের মধ্যে বেশ জোড় বেঁধে গিয়েছিল। কাজও করত তারা একইসঙ্গে। এখানে এই খামারেও তাই তাদের একই লাঙলে জুতে দেওয়া হল। দুজনেরই চেহারা শীর্ণদুর্বল, দুজনেই অস্থিসার। মাথার অর্ধেকটা কামানো। অন্যান্যেরা তাদের দেখে হেসেই অস্থির। কোত্থেকে যে এদের নিয়ে আসা হয়েছে, চেহারা দেখলে তা আর বুঝতে বাকী থাকে না। বারাব্বাস অবশ্য দুদিনেই একটু চাঙ্গা হয়ে উঠল। স্বভাবতই লোকটা বেশ শক্তসমর্থ। অবস্থা-গতিকে স্বাস্থ্যটা একটু ভেঙে গিয়েছিল, এইমাত্র। দুজনে মিলে ভালই কাজ চালিয়ে যেতে লাগল তারা।

খামারের কর্তাও তা দেখে খুশী হল। শত হলেও এরা খনির থেকে এসেছে সেটাও তো বিবেচনা করে দেখতে হবে।

তাম্রখনির সেই অন্তহীন অন্ধকারের থেকে যে তারা মুক্তিলাভ করেছে, শাহাক আর বারাব্বাসের তার জন্যে কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। এখানেও অবশ্য তাদের উদয়াস্ত খাটতে হয়। কিন্তু তা হোক, আগের থেকে এ-জীবন অনেক ভাল। এখন অন্তত তারা উন্মুক্ত আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে কাজ করতে পারছে, প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিতে পারছে। কাজ করতে করতে হাত পা এক এক সময় অসাড় হয়ে আসে। তার জন্যে তাদের এতটুকুও দুঃখ নেই। সূর্যালোকের এই দগ্ধকরা প্রহারের মধ্যেও যে এত আনন্দ সঞ্চিত হয়ে ছিল, কে জানত। এমনিতে কিন্তু অবস্থার বিশেষ কিছু তারতম্য ঘটেনি। কাজে যদি একবার ছেদ পড়ে তো আর রক্ষে নেই। অমনি এসে চাবুক আছড়ে পড়ে। বারাব্বাসের তুলনায় শাহাক অনেক দুর্বল। মারটা তাই তাকেই বেশী খেতে হয়। কিন্তু তা নিয়ে কোনো আক্ষেপ নেই কারুর। তারা যে প্রাণ ফিরে পেয়েছে, ভূগর্ভের অন্ধকারের থেকে এই আলোক-উদ্ভাসিত পৃথিবীর উপরে উঠে আসতে পেরেছে, এইতেই তারা সুখী! সকালের পর সন্ধ্যা, দিনের পর রাত্রি; পৃথিবীর এই পটপরিবর্তনকে যে তারা এখন দু-চোখ ভরে দেখে নিতে পারছে, এর থেকে আর বড় পুরস্কার, বড় আনন্দ, তারা আশা করে না। তবে হ্যাঁ, একটা কথা তারা বুঝতে পেরেছে; —ঈশ্বরের রাজ্য এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

খামারের অন্যান্য ক্রীতদাসেরা আগে তাদের দিকে কৌতূহলভরে তাকিয়ে থাকত; এমন একটা ভাব দেখাত যেন তারা মানুষ নয়, অদ্ভুত কোনো জন্তু-জানোয়ার। মাথায় আবার চুল গজাল তাদের। স্বাস্থ্যও একটু সেরে উঠল। অন্যান্যদের সঙ্গে আর তেমন কোনো পার্থক্য রইল না। তারা যে এক সময়ে খনির মধ্যে বন্দী ছিল, তাতে অবশ্য কেউ তেমন বিস্মিত নয়; বিস্মিত এই কারণে যে, সেখান থেকে তারা মুক্তিলাভ করেছে। সত্যি বলতে কি, নবাগত এই লোক দুটির সম্পর্কে যে তাদের এত কৌতূহল, তা শুধু এই কারণেই। আর সেই কৌতূহল একটুবা শ্রদ্ধাবিমিশ্র। কী করে তারা মুক্তিলাভ করল, সবাই

জানতে চায়। জানবার জন্যে চেষ্টাচরিত্রও তারা কিছু কম করেনি। কিন্তু মুশকিল এই যে লোকদুটি বড় স্বল্পবাক। বিশেষ করে কীভাবে তারা মুক্তিলাভ করেছে তা নিয়ে তারা কথাই বলতে চায় না। ব্যাপারটা যে একটু রহস্যময় তাতে আর সন্দেহ কি।

শাহাক আর বারাব্বাস, পরস্পরের সঙ্গে এখন আর তারা শৃঙ্খলাবদ্ধ নয়। একসঙ্গে খেতে বসবার বা পাশাপাশি শোবারও তাই আর এখন দরকার নেই। এমন কি, ইচ্ছে করলে আর-পাঁচজনের সঙ্গে তাদের বন্ধুত্ব করাও সম্ভব। কিন্তু দেহের শিকলটা খসে পড়লে কি হয়, মনের শিকলটা খসেনি। এক মুহূর্তের জন্যে কেউ কাউকে ছেড়ে থাকে না। অথচ তাদের মধ্যে মিলের থেকে অমিলটাই যে বেশী তাও তারা জানে। আর তাই কেউ কারুর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পর্যন্ত পারে না, কথা কইতেও কেমন সঙ্কোচ বোধ হয়। নিরবচ্ছিন্ন এই সান্নিধ্যের মধ্যেও যেন কোথায় কি একটা ব্যবধান থেকে গেছে।

কাজ করবার সময় তাদের একত্র না থেকে উপায় নেই। কিন্তু তারপর তো তারা আলাদা হয়ে যেতে পারে, অন্যান্যদের সঙ্গে গিয়ে মিশতে পারে। তেমন কোনো ইচ্ছে পর্যন্ত তাদের হয় না। একসঙ্গে বাঁধা থাকতে থাকতে সেইটেই এখন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। আর তা এতই দৃঢ়মূল যে রাত্রির অন্ধকারে মাঝে মাঝে যখন ঘুম ভেঙে যায়, ঘুম ভেঙে যখন তারা দেখে যে পরস্পরের সঙ্গে আর তারা শৃঙ্খলাবদ্ধ নয়, অদ্ভুত একটা আতঙ্কে তাদের সারা মন তখন হঠাৎ [illegible] হয়ে আসে। তারপর ধীরে ধীরে যখন তারা বুঝতে পারে যে, তারা পাশাপাশিই শুয়ে রয়েছে, দমবন্ধ সেই ভয়ের বোঝাটা আবার বুকের উপর থেকে নেমে যায়। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আবার তারা ঘুমিয়ে পড়ে।

বারাব্বাস কি কখনো ভাবতেও পেরেছিল যে, শেষকালে তার এই অবস্থা হবে,—এই ভাবে তাকে অষ্টপ্রহরের জন্য আর একজনের সঙ্গে জড়িয়ে যেতে হবে?—এ তার জীবনে অস্বাভাবিক এক অবস্থার উদ্ভব হয়েছে। কারুর সঙ্গেই তার কখনো খাপ খায়নি, খাওয়া সম্ভব নয়। আর আজ এক লৌহশৃঙ্খলের বন্ধনে

অনিজ্ঞাসকেও সে কিনা বাঁধা পড়ে গেল। শৃঙ্খলটা নেই, তবু আছে। ছিঁড়তে গিয়েও সে তাকে ছিঁড়তে পারছে না।

শাহাকের কথা আলাদা। বন্ধনেই তার সুখ। বারাব্বাসের সঙ্গে যে তার একটি নিবিড় অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল তা আর এখন নেই। তাইতেই সে মুষড়ে পড়েছে। কেন নেই?

খনিগর্ভের সেই নরককুণ্ডের থেকে যেভাবে তারা মুক্তিলাভ করেছে তা প্রায় অলৌকিক। কিন্তু তা নিয়ে আর তারা কোনো কথাবার্তা বলে না। প্রথম প্রথম দু-একদিন বলেছিল, তারপরে আর না। শাহাক বলেছিল, ঈশ্বরপুত্রই তাদের মুক্তিদান করেছেন। মানুষের তিনি ত্রাণকর্তা। ত্রাণকর্তাই তাদের মুক্তি দিয়েছেন…ত্রাণকর্তাই নিশ্চয়ই তাদের…, কিন্তু সত্যিই কি তাই? শাহাককে তিনি মুক্তি দিয়েছেন বটে, বারাব্বাসকে না। বারাব্বাসকে মুক্তি দিয়েছে শাহাক। তাই না? তাই না?

বলা বড় শক্ত।

কিন্তু সে যাই হোক, শাহাককে সে ধন্যবাদ জানিয়েছে। ঈশ্বরকে জানিয়েছে কি? হ্যাঁ, তা জানিয়েছে বৈ কি। না কি জানায়নি? কে জানে!

বারাব্বাসকে শাহাক বড় ভালবাসে। সে ভালবাসা ভারী নিবিড়। কিন্তু দুঃখ এই যে, বারাব্বাসের সম্পর্কে সে প্রায় কিছুই জানে না। খনিগর্ভের সেই অন্ধকারে, সেই নরকযন্ত্রণার মধ্যেও তারা একত্রে প্রার্থনা করতে বসত। আজকাল আর বারাব্বাস প্রার্থনা করেনা। মাঝে মাঝে শাহাকের ব ইচ্ছে হয়, আবারো তারা একত্র প্রার্থনায় বসবে। তা বুঝি আর হবার নয়। ভাবতেও ভারী দুঃখ লাগে, ভারী কষ্ট হয়। কিন্তু এ নিয়ে সে কখনও কিছু বলেনি বারাব্বাসকে। তার এই দুর্বোধ্য দুর্জ্ঞেয় আচরণে সে কষ্ট পেয়েছে, তবু বলেনি।

বারাব্বাসকে সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। না পারুক, তবু সে তাকে ভালবাসে। ত্রাণকর্তাকে যে মৃত্যু বরণ করতে দেখেছে, সে-তো এই বারাব্বাস। সে তাঁকে পুনর্জীবন লাভ করতেও দেখেছে। দুঃখ এই যে, তা নিয়ে আর আজকাল তাদের মধ্যে কোনো আলোচনা হয় না।…

কষ্ট হয় শাহাকের, এক এক সময় তার ভারী কষ্ট হয়। কিন্তু সে কষ্ট তার নিজের জন্যে না। একমাথা পাকা চুল। আর সেই ধবধবে শাদা চুলের নীচে তার রোগা-রোগা মুখখানিকে তখন ভারী করুণ দেখায়। গায়ের রক্ত জলে গিয়েছে, মুখের উপরে পোড়া দাগ। ধাতু-গলানো চুল্লীতে যখন কাজ করত, আগুনের ফুলকি লেগে পুড়ে গিয়ে থাকবে। চাবুকে চাবুকে সারা দেহ তার ক্ষতবিক্ষত। কিন্তু তা নিয়ে সে কখনও দুঃখ করে নি। সে দিক থেকে তার এতটুকুও দুঃখ নেই। সে তো সুখী। তার প্রভু তাকে মুক্তি এনে দিয়েছেন, অন্ধকারের থেকে আলোতে নিয়ে এসেছেন। তার আবার দুঃখ কিসের।

মুক্তি তিনি শুধু তাকেই দেননি, বারাব্বাসকেও দিয়েছেন। কিন্তু মুক্তি পেয়েও বারাব্বাসের সুখ নেই। কী যেন এক অস্বস্তি, কী যেন এক সন্দেহ তাকে পীড়ন করছে সারাক্ষণ। কী যেন এক চিন্তায় সে মুহ্যমান হয়ে রয়েছে। তা যে কী, কেউ জানে না।

লাঙল টানার কাজ ততদিনে শেষ হয়ে গিয়েছে। এইবারে তাদেরকে জল-কলের সঙ্গে জুতে দেওয়া হলো। গরম পড়বার সঙ্গেসঙ্গেই জলকল চালু করতে হবে, তা যদি না হয় তো ক্ষেতখামার সব শুকিয়ে যাবার আশঙ্কা। এও খুব পরিশ্রমের কাজ। তারপর, ফসলকাটা ততদিনে শেষ হয়েছে, দুজনকেই তাদের গম পেষাইয়ের কল্লে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। গমকলের একটু দূরেই হল রোমান শাসনকর্তার প্রাসাদ। আর সেই প্রাসাদ, গম-কল, আরো গোটাকতক বাড়ি আর ঘিঞ্জি একটা গ্রাম—সবকিছু মিলিয়ে ছোট্ট একটা শহর গড়ে উঠেছে। পাশেই বন্দর। সমুদ্রের তারা এখন খুবই কাছাকাছি।

আর এইখানে এই গমকলের মধ্যে আর-একজনের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হলো। লোকটা খর্বকায়, কাণা।

সেও আসলে একজন ক্রীতদাস। মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা, মুখখানা ফ্যাকাশে, বলিরেখাঙ্কিত। চোখ মাত্র একটা। সে চোখ বড়ই চঞ্চল। ময়দা চুরি করেছিল বলে অন্য চোখটা তার উপড়ে ফেলা হয়েছে। এই একই অপরাধের শাস্তিহিসেবে গলার চারদিকে তার বিরাট একখানা কাঠের ফ্রেম আটকানো থাকে।

থলের মধ্যে ময়দা বোঝাই করে তারপর সেই থলেগুলোকে নিয়ে গুদামঘরে পৌঁছে দিয়ে আসা, এই হলো লোকটার কাজ। সত্যি বলতে কি, তার এই কাজের মধ্যে কিংবা তার বিবর্ণ খর্বকায় চেহারার মধ্যে কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। বৈশিষ্ট্য তার অন্য জায়গায়; তার উপস্থিতিতে সবাই যেন কেমন অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। লোকটা যদি কখনো কারুর ধারেকাছে এসে দাঁড়ায়, ফিরে না তাকিয়েও সান্নিধ্য টের পাওয়া যায় তার। বড়-একটা কেউ কখনো তার মুখোমুখী হয়নি।

গমকলে যে নতুন দুজন লোক এসেছে, সেদিকে যেন তার ভ্রূক্ষেপমাত্র নেই। তারা যেন তার চোখেই পড়েনি। চোখে কিন্তু ঠিকই পড়েছে; শাহাক আর বারাব্বাসকে যে এখানকার সবচাইতে ভারী ওজনের যাঁতাটায় সঙ্গে জুতে দেওয়া হয়েছে, তাও পর্যন্ত তার চোখ এড়ায়নি। চিমড়ে ধরা ঠোঁটের উপরে তার অদ্ভুত একটা হাসি ফুটে উঠেছিল। তবে তা কেউ দেখতে পায়নি। সবশুদ্ধ এখানে চারটে যাঁতা। যাঁতাপিছু দু'জন করে ক্রীতদাস। আগে এখানে গাধা দিয়ে যাঁতা ঘোরানো হত। তারপর, গাধা কমে যাওয়ায় আর মানুষ বেড়ে যাওয়ায়, মানুষ দিয়েই এখন যাঁতা ঘোরানো হচ্ছে। খরচাও এতে কম পড়ে। শাহাক আর বারাব্বাস কিন্তু তাতেই তুষ্ট। আগের চাইতে তারা এখন বেশি খেতে পাচ্ছে। কষ্টও অনেক কম। খাটতে অবশ্য এখনও হয়। কিন্তু তাতে কি। সর্দার লোকটা ভাল, খুব একটা কিছু অত্যাচার করে না। দীর্ঘ একখানি চাবুক নিয়ে সে ঘুরে বেড়ায়। চাবুকটা মাঝে মাঝে আস্ফালনও করে। কিন্তু মারে না। মাত্র একজনের উপরেই তারা তাকে চাবুক চালাতে দেখেছে। লোকটা বুড়ো, অন্ধ। তিনকাল গিয়ে এখন এককালে এসে ঠেকেছে।

ময়দা উড়ে উড়ে গমকলের ভিতরটা একেবারে শাদা হয়ে গেছে। মেঝে, দেয়াল, ছাদ—যেদিকে তাকাও, শাদা। আনাচে-কানাচে মাকড়সার জালেও গিয়ে ময়দা জড়িয়ে রয়েছে। বাতাসেও ময়দার গুঁড়ো, নিঃশ্বাস টানতে কষ্ট হয়। আর তারই মধ্যে, দম-আটকা বাতাস কাঁপিয়ে, সারাক্ষণ একটা আওয়াজ উঠতে থাকে। ঘর্ঘর, ঘর্ঘর। যাঁতা চলছে। ক্রীতদাসরা সব এখানে উলঙ্গ হয়ে

কাজ করে। একমাত্র খর্বকায় সেই কানা লোকটা বাদে। কোমরে তার ছোট্ট একটা লেংটি জড়ানো। তাই পরে সে নিঃশব্দে, প্রায় ইঁদুরের মতো, এ-ঘর ও-ঘর ছুটোছুটি করতে থাকে। তার পায়ের পর্যন্ত তখন শব্দ শোনা যায় না। গলার সঙ্গে কাঠের একটা ফ্রেম আটকানো। দেখে মনে হয় একটা ইঁদুরকে যেন ফাঁদের মধ্যে আটকে ফেলা হয়েছিল, ফাঁদ ভেঙে সে পালিয়ে এসেছে। সবাই বলে, ফ্রেম আটকে দিলে কি হয়, এখনও নাকি ও গুদাম-ঘরের মধ্যে গিয়ে ময়দা চুরি করে খায়। এবারে যদি ধরা পড়ে তো আর রক্ষে নেই, বাকী চোখটাকেও ওর উপড়ে ফেলা হবে। আর ওই অন্ধবুড়োর মতই নাকি তখন যাঁতায় জুতে দেওয়া হবে ওকে। ওকি তা জানে না? জানে, তবু ময়দা খায়। কথাটা যে কতদূর সত্যি, বলা শক্ত।

নতুন যে দু'জন লোক এসেছে এখানে, সেদিকে তার বিশেষ কোনো মনোযোগ নেই। সে শুধু তার চোরা চাউনি হেনে এদের লক্ষ্য করে যাচ্ছে। তা সেতো সবাইকেই করে। লক্ষ্য করে যাচ্ছে, কখন কি ঘটে। তাই বলে এদের বিরুদ্ধে তার বিশেষ কোনো অভিযোগ নেই। এরা নাকি তামার খনি থেকে এসেছে। এর আগে সে খনির লোক দেখেনি। না দেখুক, তাদের সম্পর্কে কোনো অভিযোগও তার নেই। কারুর সম্পর্কেই নেই।

খনিতে ছিল যখনি, নিশ্চয়ই এরা মারাত্মক কোনো অপরাধ করেছে। তবে দুজনের একজনকে কিন্তু নেহাৎ ভালমানুষ বলে মনে হয়। অন্যজনের চেহারা রুক্ষকঠিন, ভয়াবহ। আর সেই ভয়াবহ ভাবটাকেই সে সবসময় গোপন করে রাখতে চাইছে। লোকটা যে পাকা বদমাস তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অন্যজন একটু বোকাসোকা। কিন্তু খনির থেকে এরা মুক্তি পেল কি করে। কী করে এরা বেরিয়ে এল? কার সাহায্যে? রহস্য বটে। আর দিবারাত্রি যদি কেউ কোনো রহস্যের পিছনে লেগে থাকে, দেরিতে হলেও একটা-না-একটা সমাধান তার খুঁজে পাওয়া যায়ই। যতই দুর্জ্ঞেয় মনে হোক প্রথমটায়, শেষ পর্যন্ত তা প্রাঞ্জল হয়ে আসে; তখন আর তাকে হেঁয়ালি বলে মনে হয় না। তবে কিনা কোনো রহস্যেরই চাবিকাঠি খুব সহজে পাওয়া যায় না। তার জন্যে

চোখকান একটু খোলা রাখতে হয়। এ-লোকটাও তার চোখকান খোলা রাখল। রেখে অপেক্ষা করতে লাগল।

দিন কয়েক বাদেই তার নজরে পড়ল, নবাগত লোক দুজনের মধ্যে যে একটু রোগা আর ঢ্যাঙা—চোখদুটি যার বিস্ফারিত—রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে নতজানু হয়ে সে প্রার্থনায় বসেছে। কিন্তু কেন? কার উদ্দেশ্যে এই প্রার্থনা? কোনো দেবতার উদ্দেশ্যে নিশ্চয়ই? কে সেই দেবতা, এমন করে যাকে প্রার্থনা জানাতে হয়?

অনেক দেবতার কথাই কানা-লোকটা জানে। তবে তাদের কারুর কাছেই সে কখনো প্রার্থনা জানায়নি। জানালেও নিশ্চয়ই এভাবে জানাত না। সবাই যেমন মন্দিরে যায়, সেও তেমনি মন্দিরে গিয়ে দেবমূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা জানাত। রহস্যময় এই ক্রীতদাসের কিন্তু মন্দিরে যাবার দরকার হয়নি। অন্ধকারে বসেই সে তার প্রার্থনা জানাচ্ছে। আর সেই প্রার্থনার মন্ত্রকেও সে এমনভাবে উচ্চারণ করছে যেন দেবতা তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। অলক্ষ্য সেই দেবমূর্তির সঙ্গেই সে কথা কইছে যেন। আশ্চর্য! প্রার্থনার ভঙ্গীতে কার সঙ্গে ও অমন কথা কইছে? কই, কাউকেই তো দেখা যাচ্ছে না? সবকিছুই ওর কল্পনামাত্র। অবাস্তব।

অবাস্তব কোনো কিছুর সম্পর্কেই কারুর খুব বেশী আগ্রহ জাগে না। কিন্তু সেদিনকার সেই ব্যাপারটার পর থেকে কানা লোকটা এখন শাহাকের সঙ্গে একটু মাখামাখি শুরু করে দিয়েছে। কে এই দেবতা, কথাবার্তার মধ্যে দিয়েই সে তা জেনে নিতে চায়। জানাতে শাহাকের কোনো আপত্তি নেই। যথাসাধ্য সে তাকে সব বুঝিয়ে বলল। বলল যে তার এই ঈশ্বর সর্বত্রই বিরাজমান। এমন কি অন্ধকারেও। সব জায়গাতেই তাঁকে ডাকা যেতে পারে, তাঁর উপস্থিতিকে অনুভব করা যেতে পারে। মানুষের হৃদয়ের মধ্যেও তাঁর আসন পাতা রয়েছে। তার চাইতে বড় সান্ত্বনা আর অন্য কিছুই নেই। সব শুনে কানা লোকটা বলল যে, তা যদি হয় তো খুবই আশ্চর্যের কথা। তার এই ঈশ্বরকে তাহলে খুবই শক্তিশালী বলতে হবে। শাহাক বলল, শক্তির তাঁর অভাব নেই। শাহাকের

এই দেবতা অদৃশ্য; শক্তিতে অতুলনীয়। কানা লোকটা এক মুহূর্ত একটু ভেবে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, এই ঈশ্বরই কি তাদের তাম্রখনির থেকে মুক্তি দিয়েছেন?

শাহাক বলল:

—হ্যাঁ, তিনিই আমাদের মুক্তিদান করেছেন।

তার মনে হলো, লোকটা যেন আরও কিছু জানতে চায়। নিজেও সে জানাতেই আগ্রহশীল। সে তাই বলল, নিপীড়িত মানুষের তিনি ত্রাণকর্তা। পৃথিবীর সমস্ত ক্রীতদাসকেই তিনি একদিন শৃঙ্খলমুক্ত করবেন। লোকটা তা শুনে বিস্মিত হয়ে গেল।

খর্বকায় এই লোকটা—একটা চক্ষু যার উপড়ে ফেলা হয়েছে—কেউ একে নিয়ে কখনো মাথা ঘামায়নি। কে জানত, তার নিজের এবং আর-পাঁচজনের পরা-মুক্তির জন্যে সে এত আগ্রহশীল। তার এই আগ্রহের মধ্যে শাহাক ঈশ্বরের ইচ্ছাকেই অনুভব করল। আর তাই মনে হলো, সব কথাই একে খুলে বলা উচিত। এর পর প্রায়ই তাদের মধ্যে দেখা হতে লাগল, আলোচনা চলতে লাগল। বারাব্বাসের এসব ভাল লাগে না। দেখে মনে হয়, অচেনা এই লোকটাকে সে একটু সন্দেহ করতে শুরু করেছে। শাহাকের মনে কিন্তু বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই, সে এখন সর্বভয়মুক্ত। আর তাই কাজকর্ম চুকিয়ে দিয়ে একদিন সন্ধ্যায় যখন তারা যাঁতাকলের পাশে বসে সবাই বিশ্রাম করছে, খর্বকায় সে লোকটার হাতে ঈশ্বরের নাম-খোদাই-করা চাকতিখানা তুলে দিতেও তার দ্বিধা হলো না। ঈশ্বরের নাম কী, লোকটা জানতে চেয়েছিল। নামটা বলল শাহাক। তারপর সেই চাকতিখানাকে তার হাতে তুলে দিল। বলল যে, এক গ্রীক ক্রীতদাসকে দিয়ে সে তার চাকতির উপরে ঈশ্বরের নাম খোদাই করে নিয়েছে। হরফগুলিকে সে অবশ্য চেনে না।

লোকটার আগ্রহ আর এরপর চাপা রইল না; গভীর মনোযোগের সঙ্গে সে সেই দুর্বোধ্য আঁকিবুকিগুলির দিকে তাকিয়ে রইল।

চাকতিখানাকে ফিরিয়ে নিয়ে শাহাক সেটিকে তার বুকের উপরে চেপে ধরল একবার। তারপর আবেগরুদ্ধ গলায় বলল যে, সে এই ঈশ্বরেরই ক্রীতদাস। একমাত্র ঈশ্বরই তার প্রভু।

—তাই নাকি? কানা লোকটা বলল,—আর ওই যে তোমার নদী, তার চাকতিটাতেও কি ঈশ্বরের নাম খোদাই করা আছে?

শাহাক বলল, নিশ্চয়ই।

শুনে লোকটা বলল, আগেই সে তা অনুমান করতে পেরেছিল। বলল বটে, কিন্তু আসলে সে তা কল্পনাই করতে পারেনি। বীভৎসদর্শন ওই লোকটা, চোখের নীচে যার অত বড় একটা ক্ষতচিহ্ন, এতদিনের মধ্যেও যাকে একবার প্রার্থনায় বসতে দেখা গেল না, তারও কিনা এই একই ঈশ্বর? এ সে কখনো ভাবতেও পারেনি। বিস্ময়টা সে প্রকাশ করল না। আগের মতই যাওয়া-আসা করতে লাগল। তার কথাবার্তা থেকে শাহাকের মনে হলো, ধীরে ধীরে সে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে আসছে। সত্য গোপন না করে শাহাক তাহলে ভালই করেছে। ঈশ্বরই তার মুখ দিয়ে সব বলিয়ে নিয়েছেন।

এর কিছুদিন বাদে অস্বাভাবিক একটা ব্যাপার ঘটল। সকালবেলা তারা সবাই কাজ করছে একদিন, এমন সময় সর্দার এসে জানাল যে, শাহাক আর বারাব্বাসকে রোমান শাসনকর্তার প্রাসাদে তলব করা হয়েছে। আজই তাদের গিয়ে দেখা করতে হবে। গমকলে যেন হুলুস্থুল পড়ে গেল। এর আগে আর এমন কাণ্ড ঘটেনি। সর্দারও খুব ভয় পেয়ে গিয়েছে মনে হলো। কী যে এখন করা যায় তা সে বুঝে উঠতে পারছে না। এ কী রহস্য! সামান্য দুজন ক্রীতদাস, তাদের কিনা খোদ শাসনকর্তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করতে হবে! সর্দারকেও যেতে হবে তাদের সঙ্গে। এর আগে আর তার কখনো প্রাসাদে যাবার সৌভাগ্য ঘটেনি। সে তাই একটু ঘাবড়ে গিয়েছে। তবে হ্যাঁ, তার আর কী। লোক দুটোকে সে সেখানে পৌঁছে দিয়েই চলে আসবে। নির্দিষ্ট সময়ে গমকলের থেকে তারা রওনা হলো। উৎকণ্ঠ আগ্রহে সবাই তাকিয়ে রইল তাদের দিকে। খর্বকায় সেই কানা লোকটাও। মুখখানা তার এতই কুশ্রী যে হাসছে কিনা তা বোঝা গেল না।

অলিগলির মধ্যে দিয়ে তারা এগিয়ে চলল। শাহাক, বারাব্বাস আর সর্দার। এখানকার রাস্তাঘাট সব অচেনা। সর্দার সঙ্গে না এলে তারা পথ হারিয়ে ফেলত

নিশ্চয়ই। পায়ে পা ঘেঁষাঘেঁষি করে সর্দারের ঠিক পিছন পিছনেই চলেছে তারা। দেখে মনে হয়, আগের মতই যেন আবার তাদের দু'জনকে পরস্পরের সঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে।

প্রাসাদ-তোরণের সামনে জমকালো একজন প্রহরী দাঁড়িয়ে ছিল। সে তাদের পথ দেখিয়ে ভিতরে নিয়ে চলল। একটার পর একটা দরজা। দরজাগুলি পার হয়ে ভিতরের দিককার একটি চত্বরে গিয়ে পৌঁছুল তারা। সেখানে আবার আর-একজন তাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। তারা গিয়ে পৌঁছুতেই তিনি তাদের নিয়ে সামনে এগিয়ে চললেন। একটু বাদেই তারা মাঝারি আকারের একটি ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ঘরের দরজা খোলা। ভিতরে ঢুকেই তারা হকচকিয়ে গেল একটু। শাসনকর্তা সেখানে বসে রয়েছেন।

সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়ে মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে তারা তাঁকে অভিবাদন জানাল। আগে থাকতেই সর্দার এসব তালিম দিয়ে রেখেছিল। তবে শাহাক আর বারাব্বাসের কিন্তু এতে কোনো সায় ছিল না। শাসনকর্তা হলেও তিনি একজন মানুষমাত্র; যতই না কেন শক্তিশালী হোন, দেবতা নন। আর তাই এভাবে যে তাঁর সামনে এসে আভূমি নত হয়ে অভিবাদন জানাতে হবে, ভাবতেই যেন সারাটা মন তাদের বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। সে যাই হোক, সর্দারের নির্দেশ অমান্য করতেও তারা সাহস পায়নি। মাটিতে মাথা ঠেকিয়েই পড়ে ছিল তারা, শাসনকর্তা তাদের উঠে দাঁড়াতে বললেন। ঘরের এককোণে চেয়ারে হেলান দিয়ে তিনি বসে রয়েছেন। আদেশ পেয়ে তারা তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। শাসনকর্তার বয়েস প্রায় বছর ষাটেক হবে। শক্ত সমর্থ চেহারা; মুখখানা ভরাট, তবে মেদবহুল নয়। চওড়া চিবুকে বেশ খানিকটা কর্তৃত্বের ভাব ফুটে উঠেছে। চাউনিটাও তীক্ষ্ণ। তবে ক্রুদ্ধ নয়। না, লোকটার চেহারার মধ্যে ভয় পাবার মতো কিছু নেই। সর্দারের কাছে তিনি শাহাক আর বারাব্বাসের সম্পর্কে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। ঠিকমতো এরা কাজকর্ম করছে তো? সর্দারের কোনো অভিযোগ নেই তো এদের সম্পর্কে? আমতা আমতা করে সে জবাব দিল, না—তার কোনো অভিযোগ নেই। তার পরে

বলল যে, সব সময়েই সে ক্রীতদাসদের খুব কড়া শাসনে রাখে। উত্তর শুনে তিনি খুশী হলেন কিনা বোঝা গেল না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে একবার তাকালেন শুধু। তার পরে হাতখানাকে একবার সামনের দিকে আন্দোলন করলেন। অর্থাৎ সে এবারে যেতে পারে। লোকটা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। সে তখন পালাতে পারলেই বাঁচে।

শাসনকর্তা তখন শাহাক আর বারাব্বাসের দিকে ফিরে তাকালেন। একটার পর একটা তিনি তাদের প্রশ্ন করতে লাগলেন। কোত্থেকে তারা এসেছে, তাদের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল কেন, খনির থেকে তারা মুক্তি পেল কি করে, কে তাদের মুক্তিদান করল—এই সব নানান ধরনের প্রশ্ন। কণ্ঠস্বরে কিন্তু বিন্দুমাত্র ক্রোধ নেই, বরং বেশ খানিকটা মমতা ফুটে উঠেছে। তারপর এক সময়ে তিনি তার আসনের থেকে উঠে দাঁড়ালেন। দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ পুরুষ। শাহাকের কাছে এসে তিনি তার চাকতিখানাকে হাতে তুলে নিলেন। নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এই যে এর উপর একটি ছাপ মারা রয়েছে, সে কি এর অর্থ জানে? শাহাক বলল, জানে। এ ছাপ রোমান রাষ্ট্রের। শুনে তিনি সম্মতির ভঙ্গীতে মাথা নাড়লেন। বললেন,—ঠিক; এবং এ-ছাপের অর্থ হল এই যে, রাষ্ট্রই শাহাকের মালিক। কথা শেষ করে চাকতিখানাকে তিনি উল্টে ধরলেন। উল্টোপিঠে দুর্বোধ্য সেই অক্ষরগুলি খোদাই করা রয়েছে। কৌতূহলভরে সেই লেখার দিকে তিনি তাকিয়ে রইলেন খানিকক্ষণ, তারপর ধীরে ধীরে—নিচু তবু স্পষ্ট গলায়—উচ্চারণ করলেন, "ক্রীস্টোস্ য়েসাস্"। দুর্বোধ্য সেই অক্ষরগুলির যে তিনি অর্থোদ্ধার করতে পেরেছেন, ঈশ্বরের নামোচ্চারণ করতে পেরেছেন, শাহাক আর বারাব্বাস তাতে বিস্ময়বোধ করল।

—এ নাম কার? তিনি প্রশ্ন করলেন।

শাহাক বলল:

—এ আমার ঈশ্বরের নাম। বলতে গিয়ে তার গলা একটু কেঁপে গেল।

—ঈশ্বরের নাম! কই, আগে তো এ-নাম শুনিনি? তা হবেওবা।

দেবতা তো আর একজন মাত্র নয়, দেবতা অসংখ্য। সবারই কিছু নাম জেনে রাখা সম্ভব নয়। তা শুধু তোমাদের দেশেই বুঝি এঁর উপাসনা হয়?

—শুধু আমাদের দেশেই নয়, সর্বদেশেই। সকলেরই তিনি ঈশ্বর।

—সকলেরই! এ তুমি বলছ কি? সকলের তিনি ঈশ্বর, আর আমি কিনা তাঁর নাম পর্যন্ত জানি না? কিছু মনে করো না, তোমার এই দেবতাটি বুঝি একটু গোপন থাকতেই ভালবাসেন?

—হ্যাঁ, তাই।

—তা নয় হলো, কিন্তু সবারই যদি তিনি দেবতা হবেন তো তাঁর খানিকটা ক্ষমতাও আছে নিশ্চয়ই? সে ক্ষমতা আসে কোত্থেকে?

—ভালবাসার থেকে।

—ভালবাসার থেকে?…হবেওবা। তা নিয়ে আমার কিছু বলবার নেই। একটি কথার শুধু জবাব চাই আমি, চাকতির উপরে তুমি তাঁর নাম খোদাই করে রেখেছ কেন?

—তার কারণ তিনিই আমার প্রভু। আবার তার কণ্ঠস্বর একটু কেঁপে গেল।

—বটে, তিনিই তোমার প্রভু? কেন, তুমি কি তবে রাষ্ট্রের ক্রীতদাস নও? রাষ্ট্রই কি তোমার মালিক নয়?

শাহাক কোনো উত্তর দিল না। নীচের দিকে তাকিয়ে সে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। শাসনকর্তা খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপরে কণ্ঠস্বরে অল্প-একটু মমতা মিশিয়ে বললেন:

—যা বললাম তার উত্তর দাও। ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাওয়াই ভাল। বলো, রাষ্ট্রই কি তোমার মালিক নয়?

মাথা না তুলেই জবাব দিল শাহাক:

—আমার ঈশ্বরই আমার প্রভু, আমার প্রভুই আমার মালিক।

স্থির দৃষ্টিতে শাসনকর্তা তার দিকে তাকিয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তার

চিবুকখানাকে তিনি একটু তুলে ধরলেন। রোদ-খাওয়া মুখখানিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। কিন্তু কোনো কথা কইলেন না।

তারপর বারাব্বাসের কাছে এগিয়ে এলেন তিনি। তার চাকতিখানাকেও উল্টে দেখে নিয়ে প্রশ্ন করলেন:

—তুমিও বুঝি এই একই ঈশ্বরে বিশ্বাস করো?

বারাব্বাস জবাব দিল না।

—বলো, তুমিও করো?

মাথা নাড়ল বারাব্বাস।

—করো না? তবে কেন তোমরা চাকতিতে তুমি তাঁর নাম খোদাই করে রেখেছ?

আগের মতই বারাব্বাস চুপ করে রইল।

—এ যাঁর নাম খোদাই করে রেখেছ, তিনি কি তোমার ঈশ্বর নন?

অস্ফুট ম্লানবিষণ্ণ গলায় বারাব্বাস বলল:

—আমার কোনো ঈশ্বর নেই।

বারাব্বাস যে একথা বলবে, শাহাক যেন তা কল্পনাও করতে পারেনি। বিস্ময়ে বেদনায় দু'চোখে তার তীব্র একটা নৈরাশ্য ফুটে উঠল। শাহাকের দিকে না-তাকিয়েও বারাব্বাস যেন তার দৃষ্টির সেই বেদনাকে স্পষ্ট অনুভব করতে পারল। ও দৃষ্টি তার মর্মস্থলে এসে বিদ্ধ হয়েছে।

শুধু শাহাকই নয়, শাসনকর্তাও বিস্ময়বোধ করলেন। বললেন:

—কথাটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। ঈশ্বর যদি তোমার না-ই থাকবে তো এই চাকতির উপরে তাঁর নাম খোদাই করে রেখেছ কেন?

—তার কারণ, আমি বিশ্বাস করতে চাই। মাথা না তুলেই বারাব্বাস জবাব দিল।

অবাক বিস্ময়ে শাসনকর্তা তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। চেহারা রুক্ষকঠোর, চোখের নীচে গভীর একটা ক্ষতচিহ্ন। এককালে লোকটা অসাধারণ বলশালী ছিল, এখনো তা বুঝতে পারা যায়। চাউনিটা স্থূল, ভাবাহীন। শাহাকের মুখখানাকে

একটু ভালভাবে দেখবার জন্যে শাসনকর্তা তার চিবুক তুলে ধরেছিলেন; বারাব্বাসের বেলায় আর তার দরকার হল না। তেমন কোনো ইচ্ছেই হলো না তাঁর। কেন? তিনি জানেন না।

শাহাকের দিকেই আবার তিনি ফিরে দাঁড়ালেন। প্রশ্ন করলেন:

—একটু আগেই তুমি যা বলেছ, তার ফলাফলটা যে অনেক দূর গড়াতে পারে তা কি তুমি জানো? তোমার এই চাকতির উপরে রোমান রাষ্ট্রের অধীশ্বর সীজারের ছাপ মারা রয়েছে। তা সত্ত্বেও যদি তুমি অন্য কাউকে তোমার প্রভু বলে ঘোষণা করো, সীজারের বিরুদ্ধেই তাহলে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হয়। সীজারও দেবতাতুল্য। তাঁকে অস্বীকার করে অন্য এক দেবতাকে তুমি তোমার প্রভু বলে গ্রহণ করেছ, তোমার চাকতির উপরে তাঁর নাম খোদাই করে রেখেছ। অর্থাৎ তুমি বলতে চাও যে, সীজার তোমার প্রভু নন, সেই দেবতাই তোমার প্রভু। তাই না?

—হ্যাঁ, তাই। বলতে গিয়ে শাহাকের গলাটা একটু কেঁপে গেল। কিন্তু আগের মতো অতটা আর কাঁপল না।

—এই তাহলে তোমার শেষ কথা, কেমন?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু এর পরিণামটা যে কী দাঁড়াবে, তা কি তুমি জান না?

—জানি, তা-ও আমি জানি।

শাসনকর্তা একটু চুপ করে রইলেন। সরলহৃদয় এই ক্রীতদাসের অজ্ঞাত পরিচয় ঈশ্বরের কথাই ভাবতে লাগলেন তিনি। সত্যি বলতে কি, সে-ঈশ্বরের পরিচয় তিনি জানেন। সম্প্রতি তাঁর সম্পর্কে তিনি অনেক কথাই শুনেছেন। জেরুসালেমের সেই উন্মাদকে যে কীভাবে হত্যা করা হয়েছে, তা-ও তিনি জানেন। "তিনিই সকলের শৃঙ্খলমোচন করবেন"..."ঈশ্বরের যারা ক্রীতদাস, ঈশ্বরই তাদের মুক্তিদান করবেন"...। না, এ বড় ভয়ঙ্কর বিশ্বাস, কোনো রকমেই আর একে উপেক্ষা করা চলে না। সাদাসিধে এই ক্রীতদাসকে এখন বড়ই অসহায় দেখাচ্ছে। কিন্তু না, এদের দয়া দেখান ঠিক নয়।...

—তোমার এই বিশ্বাসকে যদি তুমি বর্জন করো, তৎক্ষণাৎ তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। তাতে কি তুমি রাজী?

—না, তা আমি পারব না। শাহাক বলল।

—কেন?

—আমার ঈশ্বরকেই তাহলে বর্জন করা হয়।

—আশ্চর্য!...তুমি কি জানো না যে এর জন্যে তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে? যে-বিশ্বাসকে তুমি আঁকড়ে থাকতে চাইছ, তার জন্যে কি তুমি মৃত্যুবরণ করতে পার? এতই কি তোমার সাহস?

শান্ত গলায় শাহাক বলল:

—আমার প্রভুই তার বিচার করবেন।

—কথাটা কিন্তু খুব সাহসীর মত শোনাল না। ঠিক করে বল তো, জীবনের কি কোনো দাম নেই তোমার কাছে?

—আছে, জীবনকে আমি ভালবাসি।

—কিন্তু তোমার এই ঈশ্বরকে যদি না ছাড়ো, কেউই তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। প্রাণের মায়া তা হলে তোমাকে ছাড়তে হবে।

—তা ছাড়ব। আমার ঈশ্বরকে আমি ছাড়তে পারব না।

শাসনকর্তা আর কোনো পীড়াপীড়ি করলেন না। হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন:

—তাহলে আর আমার কিছু করবার নেই। বলে তিনি তাঁর টেবিলের কাছে ফিরে গেলেন। হাতির দাঁতের একটা হাতুড়ি তুলে নিয়ে টেবিলের উপরেই আঘাত করলেন একবার; তারপর আপন মনেই বললেন,—তোমার ঈশ্বরও উন্মাদ, তুমিও উন্মাদ!

এবারে প্রহরী আসবে, তাদের বাইরে নিয়ে যাবে। শাসনকর্তা হঠাৎ বারাব্বাসের কাছে এসে দাঁড়ালেন, তার চাকতিখানাকে হাতে তুলে নিয়ে উল্টে ধরলেন, তারপর খাপের থেকে একখানা ছুরি বার করে নিয়ে চাকতির উপরকার 'ক্রীস্টোস্ য়েসাস্' কথাটাকে আড়াআড়িভাবে কেটে দিলেন। দিয়ে বললেন:

—তুমি তো একে বিশ্বাস করো না। নামটা তাই কেটে দিলাম।

শাহাক এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবারে সে বারাব্বাসের দিকে তাকাল। তীব্র এক অগ্নিশিখার মতই সে দৃষ্টি যেন বারাব্বাসের অন্তঃস্থলে গিয়ে বিদ্ধ হলো। তার জ্বালা সে কখনও ভুলতে পারবে না।

প্রহরী এসে বার করে নিয়ে গেল শাহাককে। বারাব্বাস দাঁড়িয়ে রইল। সে এখন একা। শাসনকর্তা বললেন যে, তার বুদ্ধি বিবেচনার পরিচয় পেয়ে তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন। বারাব্বাসকে তিনি পুরস্কৃত করতে চান। এখন থেকে সে এই প্রাসাদেই কাজ করবে। আগের মতো আর তাকে অতো খাটতে হবে না।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বারাব্বাস শুধু তাঁর দিকে তাকাল একবার। দু চোখে তার তীব্র ঘৃণা ফুটে উঠেছে। সে ঘৃণা তীক্ষ্ণমুখ তীরের মতো কাঁপছে। কিন্তু সে-তীর ওই নয়নতূণেই আবদ্ধ রইল, নিক্ষিপ্ত হলো না।

আদেশ অনুযায়ী কাজ করতে গেল বারাব্বাস।

শাহাককে যখন ক্রুশবিদ্ধ করা হলো, অল্প-একটু দূরে একটা কাঁটাঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ছিল বারাব্বাস। তার বন্ধু তাকে দেখে ফেলুক, এ সে চায়নি। কিন্তু ইতিপূর্বে শাহাকের উপর দিয়ে যে অকথ্য অত্যাচারের ঝড় বয়ে গিয়েছে তাতে আর তার তখন দেখতে পাবার মতো অবস্থা ছিল না; আত্মগোপন যদি না-ও করত বারাব্বাস, শাহাক তাকে দেখতে পেত কিনা সন্দেহ। শাসনকর্তা অবশ্য শুধু ক্রুশবিদ্ধ করবারই আদেশ দিয়েছিলেন, তার আগে আলাদা করে আর কোনো অত্যাচার চালাতে বলেন নি। কিন্তু কিছু লাভ হয়নি তাতে; প্রহরীরা ধরেই নিয়েছিল যে, বলতে তিনি ভুলে গিয়ে থাকবেন। ক্রুশবিদ্ধ করবার আগে সকলের উপরেই একদফা অত্যাচার চালিয়ে নেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রেও তার কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি। কী জন্যে যে একে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে, প্রহরীরা তা

কেউ জানত না। জানতে তাদের কোনো কৌতূহলও হয়নি। এরকম ব্যাপার তারা হামেশাই দেখে আসছে। দেখে দেখে সেটা এখন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

শাহাকের মাথার অর্ধেকটা সেই আগের মতই কামিয়ে দেওয়া হয়েছে আবার। বাকী-অর্ধেকটা রক্ত-মাখামাখি হয়ে রয়েছে। দৃষ্টি নির্বাক, ভাষাহীন। সামান্যতম সামর্থ্য অবশিষ্ট থাকলেও যে সে তার নীরব দৃষ্টিতে কী-কথা ফুটিয়ে তুলত, বারাব্বাস জানে। দু চোখে যন্ত্রণার আগুন জ্বালিয়ে নিয়ে সে শাহাকের দিকে তাকিয়ে রইল। শীর্ণ দুর্বল তার শরীর, যন্ত্রণায় কেঁপে কেঁপে উঠছে। বারাব্বাস দেখতে লাগল। এখান থেকে তার চলে যাবার ইচ্ছে নেই, ইচ্ছে থাকলেও পারত কিনা সন্দেহ। এমনিতেই শাহাক শীর্ণদেহ। এখন যেন তাকে আরো শীর্ণ, আরো দুর্বল দেখাচ্ছে। এমন লোক কি কোনো অপরাধ করতে পারে? বিশ্বাস হতে চায় না। হাড়পাঁজরা বের করা বুকের উপরে তার রোমান রাষ্ট্রের ছাপ মেরে দেওয়া হয়েছে। তার অর্থ, শাহাক রাষ্ট্রদ্রোহী। চাকতিখানাকেও খুলে রাখা হয়েছে তার। অন্য কোনো ক্রীতদাসকে তা পরিয়ে দেয়া হবে।

শহরের বাইরে ছোট্ট একটা টিলার উপরে এই বধ্যভূমি। টিলার নীচটা ছোট ছোট গাছপালা আর কাঁটাঝোপে ঘেরা। তারই একটির আড়ালে বারাব্বাস আত্মগোপন করে রয়েছে। উপরে জনকয়েক প্রহরী। তা ছাড়া আর অন্য কেউ নেই। খুব একটা কিছু মারাত্মক অপরাধের জন্যে যখন মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় কাউকে, বধ্যভূমি লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। আজ কিন্তু কেউ আসেনি। তার কারণ, একে তো শাহাককে কেউ চেনে না; তার উপরে এমন কোনো অপরাধও সে করেনি যে তাকে দেখবার জন্যে কারুর কৌতূহল হবে।

এখন বসন্তকাল। গত বছর এই বসন্তকালেই তারা তাম্রখনির থেকে মুক্তি পেয়েছিল। নীরন্ধ্র সেই অন্ধকারের থেকে বাইরের পৃথিবীতে বেরিয়ে এসে যেন অভিভূত হয়ে গিয়েছিল শাহাক; মাটিতে বসে পড়ে বিস্ময়ের আবেগে সে চিৎকার করে উঠেছিল, "তিনি এসেছেন! তিনি এসেছেন! এই তো তাঁর রাজ্য!" সব কথাই মনে পড়ছে বারাব্বাসের। আর, কী আশ্চর্য, আজকের পৃথিবীর বুকের উপরেও যেন কে একখানি গাঢ়-সবুজ চাদর বিছিয়ে রেখেছে—বধ্যভূমিতেও

ফুল ফুটে উঠেছে। একটু দূরেই সমুদ্র। তার সুনীল জলরাশির উপরে, আর পাহাড়ে পাহাড়ে, আর ঘনশ্যাম মাঠে-প্রান্তরে সূর্যালোক চিকচিক করছে। চোখ ফিরিয়ে নিল বারাব্বাস। এখন মধ্যাহ্ন। চারদিক উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, মাছি ভন্‌ভন্‌ করছে। শাহাকের গায়েও গিয়ে মাছি বসেছে, তাকে ছেঁকে ধরেছে। কিন্তু হাত নেড়ে যে তাদের তাড়িয়ে দেবে, এমন শক্তিও শাহাকের নেই। ভারী দুর্বল, ভারী নির্জীব দেখাচ্ছে তাকে। এ-মৃত্যু বীভৎস, এ-মৃত্যু কুৎসিত।

কিন্তু কী আশ্চর্য, মৃত্যুর এই শ্লথ-বীভৎস পদসঞ্চারও যেন বারাব্বাসের হৃদয়কে গভীরভাবে নাড়া দিয়ে গেছে। বিস্ফারিত চোখে সে এই মৃত্যুযন্ত্রণা প্রত্যক্ষ করছে। এ-যন্ত্রণার প্রতিটি মুহূর্তকে সে মনে রাখতে চায়।

কপালের উপরে আর শীর্ণ বাহুমূলে ঘর্মস্রোত বয়ে যাচ্ছে, দুর্বল বুকখানা যেন একটা হাপরের মতন ওঠানামা করছে, মাছিতে মাছিতে সারা দেহ ছেয়ে গিয়েছে, হাতখানা যে একটু নাড়াবে এমন শক্তিও আর নেই। মাথাটা এসে বুকের উপরে ঝুলে পড়েছে,—যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে শাহাক। জোরে জোরে নিঃশ্বাস টানছে। এখান থেকেও তার শব্দ শোনা যায়। আর সেই একটানা শব্দ শুনতে শুনতে বারাব্বাসেরও যেন হঠাৎ নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হতে লাগল। বারাব্বাসেরও সর্বাঙ্গে যেন অদ্ভুত এক যন্ত্রণাবোধ হচ্ছে, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। এ তৃষ্ণা তার, না শাহাকের? শাহাকের ওই অসহ্য যন্ত্রণাই কি বারাব্বাসের শরীরে এসে সঞ্চারিত হয়ে গেল? আশ্চর্য নয়। দীর্ঘকাল তারা পরস্পরের সঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে ছিল। কিছুই তাই আশ্চর্য নয়। বারাব্বাসের মনে হলো, এখনও যেন এক অদৃশ্য শিকল দিয়ে ক্রুশবিদ্ধ ওই লোকটির সঙ্গে তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে।

কী যেন বলতে চাইছে শাহাক, বলতে পারছে না। ঠোঁট দুখানি তার থরথর করে কাঁপছে। জল চাইছে বোধ হয়। কিন্তু কেউ তা বুঝতে পারল না। বারাব্বাসও না। কিছুই প্রায় শোনা যায়না এখান থেকে। কিন্তু তাতে কি। দৌড়ে সে তার বন্ধুর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারে; কী চাইছে শাহাক— জিজ্ঞেস করতে পারে। আর কিছু না হোক, বুকের উপরকার ওই মাছিগুলোকে অন্তত তাড়িয়ে দিতে পারে। অনেক কিছুই করতে পারে বারাব্বাস, কোনো

কিছুই সে করল না। কাঁটাকোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে শুধু তার মৃত্যুযন্ত্রণা প্রত্যক্ষ করতে লাগল। ও যন্ত্রণা শুধু শাহাকের নয়, বারাব্বাসেরও। বারাব্বাসও এখন ওই একই যন্ত্রণা অনুভব করছে। দু'চোখে তার এক তীব্র জ্বালা ফুটে উঠেছে।

আর বেশী দেরি নেই, একটু বাদেই শাহাক মারা যাবে। নিঃশ্বাস টানার একটানা শব্দটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে আসছে, এখান থেকে আর শোনা যায় না। একটু আগেও বুকটা ওঠানামা করছিল। ধীরে ধীরে মিলিয়ে আসতে আসতে স্তব্ধ হয়ে গেল একসময়। শাহাক মারা গেল। আজ আর এখানে অন্ধকার নেমে আসেনি, অলৌকিক কোনো দৃশ্যের অবতারণা হয়নি। এ-মৃত্যু শান্ত তবু সন্দেহাতীত। আজকের এই প্রহরীরাও ঠিক সেইদিনকার মতই পাশা-খেলায় মত্ত, কিন্তু সেদিনকার মতো ভয়াবহ কোনো এক তমিস্রা আর আজ তাদের ভয় পাইয়ে দিয়ে গেল না। শাহাক মারা গিয়েছে, তারা তা বুঝতে পর্যন্ত পারেনি। একমাত্র বারাব্বাসই তার সাক্ষী। প্রার্থনার ভঙ্গীতে সে হঠাৎ মাটির উপরে বসে পড়ল।

আশ্চর্য…। বেঁচে থাকলে বড় সুখী হতো শাহাক। কিন্তু তা আর হয় না। সে মারা গিয়েছে।

কার কাছে প্রার্থনা জানাবে বারাব্বাস,—কে তার প্রার্থনা গ্রহণ করবে? তার তো ঈশ্বর নেই। প্রার্থনার ভঙ্গীতেই শুধু বসে রইল বারাব্বাস, প্রার্থনা জানাল না।

আর হঠাৎ তার সেই ক্ষতবিক্ষত শ্মশ্রুসমাচ্ছন্ন মুখখানাকে সে তার দুই হাতের মধ্যে গোপন করে ফেলল। মনে হলো সে কাঁদছে।

প্রহরীদের একজন একটু বাদে চেঁচিয়ে উঠল। ক্রুশবিদ্ধ লোকটি যে মারা গিয়েছে তা হয়ত তার নজরে পড়ে থাকবে। শাহাকের মৃতদেহকে তারা ক্রুশের থেকে মাটিতে নামিয়ে আনল। এবারে তাদের ছুটি।

সমস্ত কিছুই আজ লক্ষ্য করে গিয়েছে বারাব্বাস, সমস্ত কিছুই তার মনে থাকবে।

এর কিছুকাল বাদেই শাসনকর্তা তাঁর কাজের থেকে অবসর গ্রহণ করলেন। বাকী জীবনটা তিনি রোমে গিয়ে কাটাবেন। ইতিমধ্যে তিনি প্রচুর ঐশ্বর্য সঞ্চয় করেছেন। এর আগে আর এখানকার অন্য কোনো শাসনকর্তা তাঁর মতো এত বিপুলপরিমাণ ধনসম্পত্তি নিয়ে দেশে ফিরতে পারেননি। কিন্তু শুধু নিজের জন্যেই ধনসঞ্চয় করেছেন তিনি, একথা বললে ভুল বলা হবে। এতই দক্ষতার সঙ্গে তিনি এখানকার খনি এবং অন্যান্য সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করেছেন যে, রাষ্ট্রেরও তাতে প্রচুর লাভ হয়েছে। এ-কাজের কৃতিত্ব অবশ্য তাঁর একার প্রাপ্য নয়, ক্রীত-দাসদের সর্দাররাও তার খানিকটা অংশ দাবী করতে পারে। প্রতিটি কাজেই তারা তাদের আনুগত্যের পরিচয় দিয়েছে, দরকার পড়লে অমানুষিক অত্যাচার চালাতেও কখনো দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি। তা না হলে এখানকার এই প্রাকৃতিক সম্পদকে এত পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগানো যেত কিনা সন্দেহ; স্থানীয় অধিবাসী আর ক্রীতদাসদের গায়ের রক্তকেও এত মোক্ষমভাবে শোষণ করতে পারা যেত না। কিন্তু একটা কথা,—শাসনকর্তার শাসনটাই শুধু কঠোর, নিজে তিনি কঠোর নন। কেউ যদি তাঁকে অত্যাচারী আখ্যা দেয় তো বলতে হবে, আসল মানুষটাকে সে চেনে না। অধিকাংশ লোকের কাছেই অবশ্য তিনি অপরিচিত, বাস্তবে আর কল্পনায় মেশানো রহস্যময় একটি চরিত্র। এখান থেকে তিনি এবারে বিদায় নেবেন। খনির অন্ধকারে আর ঘর্মক্ষরা রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে উদয়াস্ত যাদের পরিশ্রম করতে হয়, শুনে তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। পরবর্তী শাসনকর্তা হয়ত এতটা নিষ্ঠুর হবেন না। এই আশাতেই কয়েকটা দিন তাদের আনন্দে কাটবে এখন। শাসনকর্তা কিন্তু আজ ভারী বিষণ্ণ বোধ করছেন। দ্বীপটিকে ছেড়ে যেতে তাঁর কষ্ট হচ্ছে। এখানে তিনি সুখে ছিলেন, শান্তিতে ছিলেন।

তাঁর এই বিষণ্ণতার আর-একটি কারণ, কর্মজীবনের এবারে অবসান হলো। এখন থেকে শুধু অবসর, আর অবসর। অথচ কাজ করবার স্পৃহা তাঁর এখনো

য়নি। এখনো তিনি বলিষ্ঠ, সক্ষম। কাজ ছাড়া তিনি থাকতে পারেন না। সারা মনে তাই তাঁর আজ এক অদ্ভুত বিষাদ ছড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু একটু বা আনন্দও তার সঙ্গে মিশ্রিত। তার কারণ শুধু শাসনকার্যেই নয়, সংস্কৃতির চর্চাতেও তাঁর সমান উৎসাহ। রোমে ফিরবার পর সে-চর্চায় পূর্ণ সুযোগ পাওয়া যাবে, পাঁচজন জ্ঞানীগুণীর সংস্পর্শে থেকে চমৎকার সময় কাটবে। জাহাজের পাটাতনের উপরে একখানা আরাম-কেদারায় বসে বসে চুপচাপ তিনি এই চিন্তাই করছিলেন। একটু আগের সেই বিষণ্ণভাবটা কেটে গিয়ে সারা হৃদয় তাঁর এখন এক অপূর্ব মাধুর্যে ভরে উঠেছে।

নিজের জন্যে এখান থেকে তিনি কয়েকটি ক্রীতদাসও সঙ্গে নিয়ে চলেছেন। তার মধ্যে বারাব্বাসও আছে। বারাব্বাস এখন বৃদ্ধ। তাকে দিয়ে আর বিশেষ কিছু কাজ হয় না। তা সত্ত্বেও তার উপরে শাসনকর্তার খানিকটা মায়া পড়ে গিয়েছে। আর তা ছাড়া বারাব্বাস সেদিন যে বুদ্ধি-বিবেচনার পরিচয় দিয়েছিল, শাসনকর্তা তাতে তার উপরে খুব সন্তুষ্ট। তার বুদ্ধির পুরস্কার হিসেবেই তাকে তিনি এখন সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছেন। এতখানি দয়া, এতখানি সহৃদয়তা,—এ যেন কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।

অনুকূল বাতাস পাওয়া যায়নি, তীরে পৌঁছুতে জাহাজখানার তাই কয়েকদিন দেরি হয়ে গেল। একটানা কয়েক সপ্তাহ দাঁড় টানার পর যখন তারা ওস্টিয়ার বন্দরে গিয়ে নোঙর ফেলল, মাঝিমাল্লাদের হাত পা' থেকে তখন রক্ত ঝরছে। শাসনকর্তা তার ঠিক পরের দিনই রোমে গিয়ে পৌঁছুলেন ; মালপত্র আর সঙ্গের লোকজনদের আরও দু-একদিন দেরি হলো।

শহরের ঠিক মাঝখানটায় আগের থেকেই তিনি বিরাট এক প্রাসাদ কিনে রেখেছিলেন। শহরের এটা অভিজাত অঞ্চল। বাড়িটাও বেশ-কয়েকতলা উঁচু। দেয়ালে দেয়ালে নানান রঙের পাথর বসানো। আসবাবপত্র নিখুঁত। দেখলেই বোঝা যায় যে মনের মতন করে সবকিছুকে সাজিয়ে তুলবার জন্যে অকাতরে অর্থব্যয় করা হয়েছে। ক্রীতদাসরা থাকে একতলায়। বারাব্বাসও তাদের মধ্যে একটুখানি জায়গা করে নিয়েছে। একতলা বাদে অন্যান্য জায়গাগুলো

তার এখনো দেখা হয়নি। তবে না-দেখলেও সে খানিকটা কল্পনা করে নিতে পারে। তার কাছে অবশ্য এর কোনো মূল্য নেই। তাকে এখন এটা-ওটা টুকিটাকি কাজ করতে হয়; কোনোটাই কিছু পরিশ্রমের কাজ নয়। রসুইখানার কর্তা যখন রোজ সকালে বাজারে যায়, বারাব্বাস এবং আরো কয়েকজন ক্রীতদাসও সঙ্গে যায় তার। লোকটা একটু রুক্ষ প্রকৃতির। কিন্তু বারাব্বাসের তাতে কি।

ইতিমধ্যেই রোমের অনেকখানি তার দেখা হয়ে গিয়েছে। দেখা হয়ে গিয়েছে বললে ভুল বলা হবে,—বাজারে যাবার পথে এটা-ওটা তার চোখে পড়েছে, এইমাত্র। রাস্তাগুলি সরু সরু, সবসময়ে ভিড় লেগে থাকে; হাটে বাজারে এত গোলমাল যে কান পাতা যায় না। সব জায়গাতেই লোক গিস্‌গিস্‌ করছে। সমস্ত ব্যাপারটাকেই বারাব্বাসের যেন কেমন অবাস্তব মনে হয়; মনে হয় এ-একটা স্বপ্নমাত্র, একটু পরেই মুছে যাবে। কলকোলাহলে ঠাসা এই বিরাট জায়গাটাকে সে কখনো সত্যি বলে গ্রহণ করতে পারল না। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে কেমন উন্মনা হয়ে যায়, কোনোদিকেই আর কোনো খেয়াল থাকে না। প্রতিটি দেশের থেকেই অসংখ্য নরনারী এখানে এসে ভিড় করেছে, পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। এত ঐশ্বর্য এত সমারোহ পৃথিবীর আর অন্য কোথাও নেই। যে-কোনো লোকেরই এখানে এসে বিমুগ্ধ হয়ে যাবার কথা। বারাব্বাসের কিন্তু এতটুকুও ভাবান্তর ঘটল না। এত যে অট্টালিকা আর এত দেবালয়—অভিজাত শ্রেণীর লোকেরাও তাদের বিলাসব্যসন ছেড়ে প্রায়ই যেখানে এসে সমবেত হয়—এর কোনো কিছুই তার মনে কোনো দাগ কাটতে পারল না। অন্য কেউ হলে চোখ ঝলসে যেত। বারাব্বাসের চক্ষু তবু মৌন, নির্বাক। কোটরগত ওই চক্ষুতে বোধহয় বাইরের জগতের কোনো কিছুরই কোনো ছায়া পড়ে না! সে শুধু দেখে যায়, শুধু দেখে যায়। কোনো কিছুতেই সে বিমুগ্ধ হয় না, কোনো কিছুরই সে কেয়ার করে না। আশ্চর্য এই প্রাসাদপুরীও তার মনে ছায়া ফেলতে পারেনি। বারাব্বাস নিরাসক্ত।

কিন্তু তা-ই বা কী করে হয়? নিরাসক্তই যদি হবে তো রোমের প্রতি তার এত বিদ্বেষ কেন? রোমকে সে ঘৃণা করে।

মাঝে মাঝে এখানে প্রার্থনার মিছিল বেরোয়। বারাব্বাসের কাছে সেটা খুব অদ্ভুত লাগে। ব্যাপারটা কিছু বিচিত্র নয়, তার কারণ নিজে সে কখনো প্রার্থনা জানায় না,—তার ঈশ্বর নেই। রাস্তার একধারে দেয়ালে ঠেস দিয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকে, দু'চোখ তার বিস্ময়ে ভরে ওঠে। কোথায় যায় এরা? কৌতূহলভরে সে একদিন এদের পিছু নিয়েছিল। নানা পথ ঘুরে ঘুরে মিছিলটা শেষ পর্যন্ত এক মন্দিরে গিয়ে উঠল। এর আগে বারাব্বাস আর. কখনো এখানে আসেনি। ভিতরে ঢুকেই একটা ছবি চোখে পড়ল তার। শিশুক্রোড়ে এক মাতৃমূর্তি। মূর্তিটা কার, বারাব্বাস জিজ্ঞেস করেছিল। পাশের লোকটি বলল, দেবী আইসিসের। আর তাঁর কোলের ওই ছেলেটি হলো হোরাস। বলেই তার কেমন সন্দেহ হলো। কে এই লোকটা, দেবী আইসিসের নাম পর্যন্ত যে জানে না? আমতা-আমতা করে কী-যেন বলতে যাচ্ছিল বারাব্বাস, তার আর অবকাশ হলো না। প্রহরীরা তাকে বার করে দিল। স্পষ্টই বুঝতে পারল বারাব্বাস, সবাই তাকে এড়িয়ে যেতে চাইছে,—তাকে পরিহার করতে চাইছে। তার মা যে তাকে ঘৃণাভরে গর্ভে ধারণ করেছিলেন, জন্মকাল থেকেই যে সে অভিশপ্ত, সবাই যেন তা বুঝতে পেরে গিয়েছে,—কারুর কাছেই তা আর গোপন নেই।

রাগে আর দুঃখে চোখের নীচেকার সেই গভীর ক্ষতচিহ্নটি তার তীক্ষ্ণমুখ তীরের মতই কাঁপতে লাগল। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগল বারাব্বাস। সারাদিন সে বাড়ি ফিরল না। সমস্ত কিছুই তার ওলটপালট হয়ে গিয়েছে।··· দূর হও নাস্তিক!···নাস্তিক! বারাব্বাস প্রায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠল। সে যে কোথায় চলেছে, কী করছে, সে জানে না। গভীর রাত্রে বাড়ি ফিরল বারাব্বাস। আর কেউ হলে এই দেরির জন্যে তাকে কঠিন শাস্তি পেতে হত। বারাব্বাসকে কেউ কিছু বলল না। তার কারণ মালিক তাকে একটু স্নেহের চোখে দেখে থাকেন। বারাব্বাস বলল যে, রাস্তায় বেরিয়ে সে পথ হারিয়ে ফেলেছিল। কারুর কাছেই তা খুব অবিশ্বাস্য মনে হলো না। চুপচাপ গিয়ে শুয়ে পড়ল বারাব্বাস। রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে তার মনে হতে লাগল, 'ক্রীস্টোস্ য়েসাস' লেখা সেই চাকতিখানার স্পর্শে বুকের চামড়া যেন তার পুড়ে যাচ্ছে।

বারাব্বাস সে-রাত্রে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল। দেখল যে অচেনা কে-একজন ক্রীতদাসের সঙ্গে যেন তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে, আর সেই ক্রীতদাস তার পাশে প্রার্থনায় বসেছে। কিন্তু কী আশ্চর্য, তার মুখ দেখা যাচ্ছে না।

—কিসের জন্যে তুমি প্রার্থনা করছ? বারাব্বাস শুধোল,—এ প্রার্থনায় লাভ কি?

—তোমার জন্যেই প্রার্থনা করছি আমি। অন্ধকারের মধ্যে থেকে তার উত্তর ভেসে এল। বারাব্বাসের মনে হলো গলাটা তার চেনা।

চুপচাপ শুয়ে রইল বারাব্বাস, যেন না তার প্রার্থনায় কোনো ব্যাঘাত ঘটে। দুই চক্ষু তার জলে ভরে উঠল। তারপরেই ঘুম ভেঙে গেল তার। কই, কেউই তো নেই,—কারুর সঙ্গেই তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা হয়নি। কারুর সঙ্গেই না।

এর কিছুদিন বাদেই অদ্ভুত একটা ব্যাপার বারাব্বাসের চোখে পড়ল। প্রাসাদের একতলার এক কোণে কে যেন অদ্ভুত একটা চিহ্ন এঁকে রেখেছে। বারাব্বাস জানে, এ-চিহ্ন ক্রীশ্চানদের। এবং ক্রীতদাসদের মধ্যেই যে কেউ একজন এ-কাজ করেছে, তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই। কে এমন দুঃসাহসী,—কে? দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ চুপচাপ বারাব্বাস সব লক্ষ্য করে যেতে লাগল,* কিন্তু সামনাসামনি কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করল না। বলতে কি, জিজ্ঞেস করলে হয়তো সহজেই এর একটা উত্তর পাওয়া যেত। সে পথে গেল না বারাব্বাস। তার কারণ অন্যান্য ক্রীতদাসের সঙ্গে তার তেমন মেলামেশা নেই। বড় একটা সে কথাও কয় না কারুর সঙ্গে। অন্যান্যরাও তাই তাকে একটু এড়িয়ে চলে।

এ-শহরে ক্রীশ্চানের অভাব নেই। বারাব্বাস তা জানে। কিন্তু তাদের খুঁজে বার করতেও সে কখনো খুব উৎসাহ বোধ করেনি। তাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি। একদিন হয়তো কোনো বন্ধন ছিল, আজ আর নেই। এই ক্রীশ্চানদের ঈশ্বরের নামই সে একদিন তার চাকতির উপরে খোদাই করিয়ে নিয়েছিল। ছুরির আঁচড়ে সে-নাম বাতিল হয়ে গেছে।

রোমের ক্রীশ্চানরা আর আজকাল প্রকাশ্যে কোথাও মিলিত হয় না। যে-কোনো মুহূর্তেই তাদের উপরে অত্যাচার আরম্ভ হয়ে যেতে পারে। প্রার্থনানুষ্ঠান তাই আজকাল গোপনে সম্পন্ন হয়। হাটে বাজারে এ-নিয়ে কানাঘুষোও হয়ে থাকে। বারাব্বাসেরও তা কানে গিয়েছে। ক্রীশ্চানদের সবাই ঘৃণা করে, অবিশ্বাস করে। বহুদিন আগে জেরুসালেমে না কোথায় যেন তাদের ঈশ্বরকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে। তাই নিয়েই কানাকানি করে সবাই। কেউই এদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চায় না।

একদিন সন্ধ্যাবেলা বারাব্বাসের চোখে পড়ল, অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দুজন ক্রীতদাস যেন নিজেদের মধ্যে কী বলাবলি করছে। বারাব্বাসকে তারা দেখতে পায়নি। বারাব্বাসও যে তাদের স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে তা নয়, সে শুধু ফিসফাস কথা শুনতে পাচ্ছে। লোক দুজনকে সে চেনে।

অ্যাপিয়ান সড়কের ধারে যে আঙুর-বাগান রয়েছে পরদিন সেখানে কী একটা সভা হবে। তাই নিয়েই এরা আলোচনা করছে। উৎকর্ণ হয়ে সব শুনতে লাগল বারাব্বাস। আরও দু-একটা কথা শুনবার পর বুঝল যে, আঙুর-বাগানে নয়, বাগানের ওদিকে ইহুদীদের যে কবরখানাটা রয়েছে সেইখানেই সবাই মিলিত হবে। প্রার্থনা করবার আর জায়গা পেল না এরা ?··· শেষকালে কিনা কবরখানার মধ্যে ? আশ্চর্য !···কী করে এমন প্রবৃত্তি হয় এদের··· ?

পরের দিন সন্ধ্যায় ক্রীতদাসদের ঘরে চাবি পড়বার আগেই গা-ঢাকা দিয়ে সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। ধরা পড়লে আর বাঁচতে হতো না।

বারাব্বাস যখন অ্যাপিয়ান সড়কে গিয়ে পৌঁছুল, চারদিক অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। রাস্তাঘাট নির্জন। একজন মেষপালক শুধু বাড়ি ফিরছে। বারাব্বাস তার কাছ থেকে আঙুর-বাগানের নিশানাটা জেনে নিল।

এর পরে আর কবরখানাটা খুঁজে নিতে তার কোনো অসুবিধা হলো না। রাস্তার উপর থেকে থাক্ থাক্ সিঁড়ি নীচে নেমে গেছে, তারপরে সারিসারি কবর। আর দু-দিককার সেই কবরের সারির মধ্য দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ চলে গিয়েছে। উপরে তবু অল্প একটু আলো ছিল, এখানে তা-ও নেই। যেদিকে

তাকায় শুধু অন্ধকার, নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। সেই অন্ধকার গলিপথের মধ্যেই হাতড়ে হাতড়ে সে সামনে এগোতে লাগল। প্রথম দিককার সারির মধ্যেই নাকি মস্তবড় একটা গহ্বর রয়েছে, সেখানে এসেই তারা মিলিত হবে। ক্রীতদাস দুজন অন্তত তা-ই বলছিল। সামনে এগোতে লাগল বারাব্বাস, স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডা পাথরের স্পর্শে সর্বাঙ্গ তার শিউরে উঠতে লাগল।

কিন্তু কই, কোথায় সেই গহ্বর? কোনোখানেই তার চিহ্ন নেই। বারাব্বাস হাঁটতেই লাগল। খানিকটা এগিয়ে আবার আর-একটা রাস্তা বেরিয়ে গিয়েছে। কোন দিকে সে যাবে এখন? ঠিক করে উঠতে পারল না বারাব্বাস। বিমূঢ় হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল। সবকিছুই তার গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। খানিকক্ষণ সেইখানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ একসময় তার চোখে পড়ল, বেশ খানিকটা দূরে কবরের ভিতরকার সেই গলিপথের উপরে যেন একটা আলোর রশ্মি এসে পড়েছে। রুদ্ধশ্বাসে সে সেইদিকে এগোতে লাগল।

আর, আশ্চর্য, দু'পা এগোতে না এগোতেই আলোটা যেন মুছে গেল হঠাৎ, অদৃশ্য হয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ থেমে দাঁড়াল বারাব্বাস। সে কি তবে অন্য কোনো রাস্তায় ঢুকে পড়েছে? দু'পা পিছিয়ে এল সে। কিন্তু না, আলোটা আর দেখা গেল না।

স্তম্ভিত হয়ে বারাব্বাস দাঁড়িয়ে রইল। কোথায় তারা, যাদের আজ এখানে আসবার কথা ছিল? কোথায় গেলে তাদের পাওয়া যাবে? না কি তারা আসেনি?

আর সে নিজেই বা এ কোথায় এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে? না, আর এগিয়ে লাভ নেই। যে-পথে এসেছে সেই পথেই সে এখন এই কবরখানার থেকে বেরিয়ে যাবে। ফিরে দাঁড়াল বারাব্বাস। তারপর কয়েক ধাপ উপরে উঠেই সে থমকে দাঁড়াল। দূরে, ছোট্ট একটা বাঁকের মাথায়, আবারো সেই আলো জ্বলে উঠেছে। সেই একই আলো, তাতে আর কোনো ভুল নেই। রুদ্ধশ্বাসে বারাব্বাস এগোতে লাগল সেইদিকে। ক্রমেই যেন আলোটা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। আরও উজ্জ্বল,—আরও।

তারপর বারাব্বাস যখন তার প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছে, দপ্‌ করে আলোটা হঠাৎ নিভে গেল।

হতবুদ্ধি হয়ে গেল বারাব্বাস। চতুর্দিকেই তার অন্ধকার। অন্তহীন মৃত্যুহিম অন্ধকার। আর সেই অন্ধকারের মধ্যে সে এখন একা দাঁড়িয়ে আছে। যাদের আসবার কথা ছিল, তারা কেউ আসেনি। জীবনের চিহ্ন পর্যন্ত কোথাও নেই। এই মৃত্যুপুরীর মধ্যে সে এখন একা।…

মৃত্যুপুরী!…শুধু কবর আর কবর। প্রতিটি রাস্তায়, প্রতিটি বাঁকে সারি সারি শুধু কবর পাতা। আর এই মৃত্যুপুরীর অধিবাসীরাই তাকে এখন ঘিরে রয়েছে, চারদিক থেকে তাকে বেষ্টন করে রয়েছে। কোনদিকে এখন যাবে সে? কোন পথে এগোলে যে এই সমাধির থেকে, এই মৃত্যুপুরীর থেকে বেরিয়ে যাওয়া যাবে, বারাব্বাস জানে না।

মৃত্যুপুরী!…মৃত্যুপুরীতে প্রবেশ করে সে তার পথ হারিয়ে ফেলেছে!…এখান থেকে আর তার মুক্তিলাভের উপায় নেই!…

বারাব্বাস আর ভাবতে পারল না। একটা বীভৎস দমবন্ধ ভয়ে যেন তার সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে এল। লৌহকঠিন একটা আতঙ্কের সাঁড়াশি দিয়ে যেন কে তার গলা টিপে ধরেছে। আর হঠাৎ দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে লাগল সে। একটার পর একটা গলি পেরিয়ে যেতে লাগল, সিঁড়িতে সিঁড়িতে হোঁচট খেতে লাগল। সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপমাত্র নেই। যে করেই হোক, যেমন করেই হোক, তাকে মুক্তিলাভ করতে হবে। দেয়ালে দেয়ালে কপাল ঠুকে যাচ্ছে, সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে,—বারাব্বাসের খেয়াল নেই। উন্মাদের মতো, তাড়া-খাওয়া একটা ভয়ার্ত জন্তুর মতো সে সেই অন্ধকার গোলকধাঁধার মধ্যে ছুটোছুটি করতে লাগল। যে করেই হোক তাকে পথ খুঁজে বার করতে হবে।

বহুক্ষণ পরে—কতক্ষণ পরে সে জানে না—হঠাৎ তার গায়ে এক ঝলক বাতাস এসে লাগল। পথ খুঁজে পেয়েছে বারাব্বাস। অর্ধ-অচৈতন্য অবস্থায় সে সেই মৃত্যুপুরীর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। সে এখন ক্লান্ত। মাঠের উপরে শুয়ে

পড়ল সে, শুয়ে শুয়ে হাঁপাতে লাগল। আকাশে তারা ওঠেনি; চারিদিকেই এখন অন্ধকার নেমে এসেছে। স্বর্গে, মর্ত্যে—সব জায়গায়।

বাড়ি ফিরবার পথে বারাব্বাসের সে-রাত্রে নিজেকে ভারী একা-একা মনে হতে লাগল। একা তো সে চিরদিনই। কিন্তু আজকের মতো এত গভীরভাবে আর কখনো তা সে উপলব্ধি করেনি; বুঝতে পারেনি যে মৃত্যুর পরেও তার সেই নিঃসঙ্গতার অবসান হবে না। অন্ধকারের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে বারাব্বাস পথ হাঁটছে। চোখের নীচে গভীর একটা ক্ষতচিহ্ন, তার বাবা ইলাহাহুর দেওয়া আঘাত। বুকের উপরে একখানা চাকতি ঝুলছে। ওর উপরে সে একদিন ঈশ্বরের নাম খোদাই করিয়ে নিয়েছিল। নামটা তারপর কেটে দেওয়া হয়েছে। স্বর্গ, মর্ত্য, সবজায়গাতেই সে একা।

নিজের হাতেই সে তার চারপাশে এক ভয়াবহ মৃত্যুপুরী গেঁথে তুলেছে। কী করে সে এখন মুক্তিলাভ করবে?

একবার, মাত্র একবার, তার এই নিঃসঙ্গতার অবসান হয়েছিল। আর-একজনের সঙ্গে সে বাঁধা পড়েছিল। কিন্তু সে বাঁধন তো শিকলের। শিকল ছাড়া আর অন্যকিছুর বাঁধনে তাকে কখনো কেউ বেঁধে রাখেনি।

রাস্তাঘাট নির্জন, নিঃশব্দ। নিজের পায়ের শব্দে সে নিজেই মাঝে মাঝে চমকে উঠছে। শব্দটা তার পায়ের, না তার হৃৎপিণ্ডের? জীবনের কোনো চিহ্ন পর্যন্ত কোথাও নেই। মৃত্যু এসে সব ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে। মৃত্যু আর অন্ধকার। আলো নেই। কোনোখানেই আর আলো নেই। তারাহীন রাত্রি। আর সেই রাত্রির হৃদয় যেন এক অন্ধকার শূন্যতায় ভরে উঠেছে।

জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগল বারাব্বাস। বাতাসটা তার গরম লাগছে। নাকি জ্বর হয়েছে তার,—যে-মৃত্যুকে সে সর্বক্ষণ তার শরীরের মধ্যে বহন করছে, তারই জন্যে নিজেকে তার অসুস্থ মনে হচ্ছে? মৃত্যু! মৃত্যুর থেকে আর নিষ্কৃতি নেই তার; যতক্ষণ সে বেঁচে আছে, থাকবে, এ-মৃত্যুর হাত থেকে তার পরিত্রাণ নেই। হৃদয়ের মধ্যে থেকেই সেই ভয়াবহ মৃত্যু তাকে তাড়িয়ে

ফিরছে, চিন্তার অন্ধকারের মধ্যেও সে এক অসহ্য আতঙ্ক ছড়িয়ে দিচ্ছে। বুড়ো হয়ে গিয়েছে বারাব্বাস। তার আর বাঁচবার ইচ্ছে নেই। তা সত্বেও এই আতঙ্কের হাত থেকে তার মুক্তি হলো না। অথচ কতকিছুই তো সে চেয়েছিল·· কতকিছুই তো সে···

না, না—সে মরবে না! সে মরবে না!···

কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে, মিলিত হবার জন্তে যারা আজ ওই অন্ধকার মৃত্যুপুরীর মধ্যে গিয়ে সমবেত হয়েছে, কই—তাদের তো কোনো ভয় নেই। মৃত্যুকে তারা ভয় করে না। মৃত্যুকে তারা জয় করেছে। তাদের বন্ধন ভালবাসারই বন্ধন। ···পরস্পরকে ভালবেসো···পরস্পরকে ভালবেসো···

বারাব্বাস গিয়ে তাদের সন্ধান পায়নি। সে শুধু সেই অন্ধকারের মধ্যে, চিন্তার কানাগলির মধ্যেই সারাক্ষণ ঘুরে মরেছে।···

কোথায় তারা? পরস্পরকে যারা ভালবাসে তারা কোথায়?

এই রাত্রে তারা কোথায়? শহরের সীমানার মধ্যে এসে বারাব্বাসের এখন আরো অসুস্থ লাগছে। এত গরম কেন? চারদিক এত গরম হয়ে উঠেছে কেন? জরাক্রান্ত এই রাত্রিকে তার অসহ্য লাগছে। দমবন্ধ হয়ে আসছে।···

আর-একটু এগিয়ে মোড় ফিরতেই একটা পোড়া-গন্ধ পাওয়া গেল। থমকে দাঁড়াল বারাব্বাস। তার ঠিক সামনেই একটা বাড়ির একতলা থেকে গলগল করে ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে। আগুন লেগেছে নিশ্চয়ই।··

আর সেই নির্জন রাস্তা হঠাৎ জনকোলাহলে ভরে উঠল। চারদিক থেকে লোক ছুটে আসছে। পাগলের মতো চিৎকার করছে—

—আগুন! আগুন।

এগিয়ে গেল বারাব্বাস। মোড় ফিরে দেখল আর-একটা বাড়িতেও আগুন জ্বলে উঠেছে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। বারাব্বাস যেন হতভম্ব হয়ে গেল, কোনো কিছুই সে আর বুঝে উঠতে পারছে না।··দূর থেকে হঠাৎ চীৎকার ভেসে এল একটা—

—ক্রীশ্চানরাই আগুন লাগিয়েছে! ক্রীশ্চানরাই!

চারদিক থেকে সে-কথার প্রতিধ্বনি উঠতে লাগল—

—ক্রীশ্চানরাই আগুন লাগিয়েছে! ক্রীশ্চানরাই!

বিমূঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে রইল বারাব্বাস, কোনো কিছুরই সে অর্থ গ্রহণ করতে পারছে না। এ-কাজ ক্রীশ্চানদের···? আর হঠাৎ, যেন একটা বিদ্যুতের ঝলকের মতো, সবকিছুই তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

হ্যাঁ, এ-কাজ ক্রীশ্চানদেরই। ক্রীশ্চানরাই রোমে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। রোমকেই শুধু নয়, সমগ্র পৃথিবীকেই তারা ভস্মীভূত করে ফেলবে।

এতক্ষণে বারাব্বাস সব বুঝতে পারল। বুঝতে পারল যে, এই জন্যেই তারা আজকের ওই প্রার্থনানুষ্ঠানে গিয়ে সমবেত হয়নি। এই পাপ-রোমকে, পাপ-পৃথিবীকে তারা পুড়িয়ে ফেলতে চায়! সেই শুভমুহূর্তই আজ সমাগত! তাদের ত্রাণকর্তাও তাই পুনরাবির্ভূত হয়েছেন!

গল্‌গথায় যাকে হত্যা করা হয়েছিল, তিনি ফিরে এসেছেন। অত্যাচারিত মানুষকে রক্ষা করবার জন্যেই আজকের এই পৃথিবীকে তিনি ধ্বংস করবেন, তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেন। এই বহ্নুৎসবের মধ্য দিয়েই তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে চলেছেন। স্ব-মহিমায় তিনি পুনরাবির্ভূত। আর বারাব্বাস, নাস্তিক বারাব্বাসই আজ তাঁকে সাহায্য করবে! আজ আর তার ভুল হবে না। না-না,—আর তার কোনো ভুল হবে না। অগ্নিকুণ্ডের দিকে দৌড়ে গেল বারাব্বাস; জলন্ত একখণ্ড কাঠ কুড়িয়ে নিয়ে পাশের একটা বাড়িতে ছুঁড়ে মারল। চতুর্দিকে সে সেই আগুন ছড়িয়ে দিতে লাগল। ভুল হয়নি! আজ আর বারাব্বাসের ভুল হয়নি। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠেছে, লেলিহান জিহ্বা মেলে দিয়ে একটার পর একটা বাড়িকে গিয়ে গ্রাস করে ফেলছে। আর সেই বিরাট বহ্নুৎসবের মধ্যে পাগলের মতো বারাব্বাস ছুটোছুটি করে ফিরতে লাগল। বুকে তার ঈশ্বরের নাম খোদাইকরা চাকতি। নামটা ওরা কেটে দিয়েছে। কিন্তু তাতে কি, আজ আর তার ভুল হয়নি। ধ্বংসের এই তাণ্ডবের মধ্যেই সে তার প্রভুর ডাক শুনতে পেয়েছে। সমস্ত কিছুকে তিনি ধ্বংস করবেন। সেই শুভমুহূর্তই আজ সমাগত। ছড়িয়ে পড়ছে, চতুর্দিকেই তাঁর ক্রোধের বহ্নি

ছড়িয়ে পড়ছে। শুধু রোমেই নয়, সারা পৃথিবীতেই তিনি আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন। সেই বিরাট অগ্নিসমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দু-চোখ তার একসময় জলে ভরে উঠল।

এই তো তাঁর রাজ্য! ভাখো, এই তো তাঁর রাজ্য!

ভূগর্ভের আধো-অন্ধকার একটি কারাকক্ষ। অগ্নি-সংযোগের অভিযোগে ধৃত ক্রীশ্চানদের এই কারাকক্ষে এনে আটকে রাখা হয়েছে। তাদের মধ্যে বারাব্বাসও আছে। হাতেনাতে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল; তারপর জেরার পর্ব সাঙ্গ হবার পর এখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সে-ও এখন এই ক্রীশ্চানদেরই একজন।

পাথর কেটে কেটে এই কারাগার তৈরী হয়েছে। দেয়াল, মেঝে—সব স্যাঁতসেতে। বাইরে থেকে অল্প একটু আলো আসে। স্পষ্ট করে তাতে কারুর মুখ পর্যন্ত দেখা যায় না। বারাব্বাস তাতে খুশীই। আলো থাকলে, কেউ তাকে দেখতে পেলে বরং তার অস্বস্তির কারণ ঘটত। এককোণে একটা ছেঁড়া মাদুরের উপরে সে বসে আছে। মনে হয়, অন্যান্যদের দৃষ্টির থেকে নিজেকে সে আড়াল করে রাখতে চাইছে।

সেদিনকার সেই অগ্নিকাণ্ড নিয়ে প্রায়ই এদের মধ্যে কথাবার্তা হয়। কী শাস্তি এদের দেওয়া হবে তা নিয়েও। তার থেকে বারাব্বাস বুঝতে পেরেছে, এদের মধ্যে কেউ আগুন লাগায়নি। আসলে সবটাই একটা সাজানো ব্যাপার। ক্রীশ্চানদের উপরে অত্যাচার চালাবার জন্যে একটা অছিলা খোঁজা হচ্ছিল, এতদিনে সেই অছিলা জুটে গিয়েছে। মিথ্যেমিথ্যি এদের উপরে দোষ চাপিয়ে দিয়ে তারপর একধার থেকে সবাইকে গ্রেপ্তার করে আনা হয়েছে। ক্রীশ্চানরা যে আগুন লাগায়নি, বিচারকও তা জানতেন। ঘটনাস্থলের কাছে সেদিন একজনও ক্রীশ্চান ছিল না। থাকবেই বা কেন। তাদের উপরে অত্যাচার শুরু করবার

জন্যে যে একটা অছিলা খোঁজা হচ্ছে, আগে থাকতেই তা তারা জেনে গিয়েছিল; কবরখানায় তাদের গোপন প্রার্থনানুষ্ঠানের কথাও যে ফাঁস হয়ে গিয়েছে, তা-ও। ক্রীশ্চানদের এ-ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও দোষ নেই। তারা নিরপরাধ। কিন্তু তাতে কি। সবাই তাদের উপরে চটা। তাদের শাস্তি হলেই সবাই খুশী হবে। ভাড়াটে জনকয়েক লোককে দিয়ে সেদিন চিৎকার করে বলানো হয়েছিল যে ক্রীশ্চানরাই আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। কেউ তা অবিশ্বাস করেনি।

—কিন্তু কে, কে এদের ভাড়া করে জুটিয়ে আনল? অন্ধকারের মধ্যে থেকে কে-একজন প্রশ্ন করল বুঝি। সে-প্রশ্নের কেউ জবাব দিল না।

আগুন লাগাবার মতো এমন একটা জঘণ্য কাজ, এ-কখনো ক্রীশ্চানরা করতে পারে? রোমকে তারা ভস্মীভূত করে ফেলতে চেয়েছিল, এ-কথা কখনো বিশ্বাস করতে পারে কেউ? প্রভু তাদের মন্ত্র দিয়েছেন, 'পরস্পরকে ভালবাসো'। করুণার তাঁর অবধি নেই। শহরে তিনি আগুন জ্বালিয়ে দেননা, হৃদয়ে জ্বালিয়ে দেন। তিনি ঈশ্বর, তিনি প্রেমময়। তিনি কেন এই অনিষ্ট করতে যাবেন?

পৃথিবীর তিনি গ্লানিমোচন করবেন, মর্ত্যভূমিতেই তিনি স্বর্গপ্রতিষ্ঠা করবেন। তাঁরই কথামতো এতদিন তারা সেই শুভমুহূর্তের প্রতীক্ষা করে এসেছে, এখনো করছে। তিনিই প্রেম, তিনিই আলো! বলে তারা সমবেত কণ্ঠে প্রার্থনা সঙ্গীত গাইল কয়েকটি। সে-গানের কথা আর সুরের মধ্যে দিয়ে যেন এক শান্ত করুণ মাধুর্য ঝরে পড়তে লাগল। অভিভূত হয়ে গেল বারাব্বাস। দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা রেখে চুপ করে সে বসে রইল। সারামনে তার এখন সেই বিষণ্ণ শান্তি ছড়িয়ে গিয়েছে।

কারাকক্ষের দরজা খুলে গেল হঠাৎ, কারারক্ষী এসে প্রবেশ করল। বন্দীদের এখন খেতে দেওয়া হবে; আলো আসবার সুবিধের জন্যে দরজাটাকে তাই খুলে রাখা হলো কিছুক্ষণের জন্যে। লোকটা ঈষৎ প্রগল্‌ভ, মুখেচোখে একটা রক্তিম আমেজ লেগে রয়েছে। অশ্লীল সব গালিগালাজ করতে করতে এক-এক জনের সামনে সে এক-একটা থালা ছুঁড়ে দিতে লাগল। দরজা খুলে রাখায় বারাব্বাসের গায়ে আলো এসে পড়েছিল; লোকটা তাকে দেখে হেসে উঠল:

—এই যে, সেই উজবুকটাও এসে জুটে গিয়েছে দেখছি। ওই হতচ্ছাড়াই তো গোমে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। আর তবু তোরা বলছিস কিনা ক্রীশ্চানদের এতে কোনো হাত নেই? তোরা সব এক-একটা ভাহা মিথ্যুক। ওকে তো সেদিন হাতেনাতে ধরে ফেলা হয়েছিল। সত্যিমিথ্যে ওকেই জিজ্ঞেস করে ছাখ। কিরে, চুপ করে রয়েছিস কেন?

মাথা নিচু করে বসে রইল বারাব্বাস। দৃষ্টি তার নির্বাক, কঠিন। চোখের নীচেকার সেই ক্ষতস্থানটা শুধু দপদপ করতে লাগল।

আর-সবাই ততক্ষণে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছে। কেউই তাকে চেনে না। প্রথমটায় তাকে সবাই সাধারণ একজন কয়েদী বলেই ধরে নিয়েছিল। কিন্তু এ-কি শুনছে? এ-ও কি ক্রীশ্চান?

—না না, এ সম্ভব নয়। অস্ফুট স্বরে কানাকানি করতে লাগল সবাই।

—কী সম্ভব নয়? কারারক্ষী জিজ্ঞেস করল।

—কিছুতেই ও ক্রীশ্চান নয়। হতে পারে না। ক্রীশ্চান কখনো কারুর অনিষ্ট করতে যায় না।

—যায় না? হেসে উঠল কারারক্ষী,—কিন্তু ও নিজেই এ-কথা বলেছে। বিশ্বাস না হয় তো ওকেই তোরা জিজ্ঞেস করে ছাখ। ওকে যারা হাতেনাতে গিয়ে ধরে ফেলে, তাদের কাছ থেকেই আমি সব শুনেছি। অত কথারই বা দরকার কি। জেরার সময় ও নিজেই এ-কথা কবুল করেছে।

—তা-ও কি সম্ভব! আমতা আমতা করতে লাগল সবাই; কণ্ঠস্বরে অস্বস্তি ফুটে উঠল। ক্রীশ্চান হলে ওকে আমরা নিশ্চয়ই চিনতাম। এর আগে আর ওকে আমরা দেখিইনি কখনো।

—তার মানে তোরা বলতে চাস যে ও ক্রীশ্চান নয়, কেমন এই তো? দাঁড়া, প্রমাণ দিয়ে দিচ্ছি!

বলে সে বারাব্বাসের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বুকের উপরকার সেই চাকতি-খানাকে উলটে ধরে বলল:

—নে, ছাখ এসে। কী লেখা রয়েছে দেখে যা। বল, এ-কি তোদের ঈশ্বরের নাম নয়? ও-কি, চুপ করে রইলি যে?

সবাই গিয়ে ততক্ষণে ঘিরে দাঁড়িয়েছে বারাব্বাসকে। বিস্ফারিত বিস্ময়ে তারা চাকতির উল্টোপিঠের সেই অক্ষরগুলির দিকে তাকিয়ে রইল। অধিকাংশই পড়তে পড়তে জানে না। যারা জানে, একটু বাদেই তাদের কণ্ঠস্বরে একটা চাপা-ভয় ফুটে উঠল।

—ক্রীস্টোস য়েসাস···ক্রীস্টোস য়েসাস···

চাকতিখানাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিজয়গর্বে কারারক্ষী ঘুরে দাঁড়াল। ব্যঙ্গভরা গলায় বলল:

—এবারে? এবারে বিশ্বাস হলো তো? আদালতে এই চাকতিখানা দেখিয়ে ও বলেছে যে, সম্রাট ওর মালিক নন, যার কাছে তোরা প্রার্থনা করিস, সেই ঈশ্বরই ওর মালিক। এ-ব্যাটাকে নির্ঘাত ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। এ আমি একেবারে হলফ করে বলতে পারি। শুধু ওকেই নয়, তোদেরো। তোদেরো ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। তোরা অবিশ্যি এই উজবুকটার চাইতে ঢের বেশী সেয়ানা, সহজে তাই কিছু কবুল করতে চাইছিস না। কিন্তু তাতেই কি তোরা রক্ষে পাবি ভেবেছিস? তোদের এই বন্ধুর কথাতেই সব ফাঁস হয়ে গিয়েছে।

বলে একগাল হেসে বেরিয়ে গেল লোকটা। দরজায় কুলুপ পড়তেই সারা ঘরে সেই আধো-অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ল।

ততক্ষণে সবাই এসে ফের বারাব্বাসকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। ক্রুদ্ধকণ্ঠে একটার পর একটা তারা প্রশ্ন করে যেতে লাগল। কে তুমি? কে? সত্যিই কি তুমি ক্রীশ্চান? কোথাকার ক্রীশ্চান? তুমিই কি তাহলে আগুন লাগিয়েছিলে?

নীরবে বসে রইল বারাব্বাস; কোনো কথারই সে জবাব দিল না। সারামুখ তার ছাইয়ের মতো শাদা হয়ে গিয়েছে; কোটরগত সেই চক্ষু দুটি যেন ক্ষোভে আর দুঃখে আত্মগোপন করতে চাইছে।

—ক্রীশ্চান! চাকতির উপরে ঈশ্বরের নামটা যে ও কেটে দিয়েছে, তা বুঝি তোমরা ছাখোনি? কে যেন প্রশ্ন করল।

—কেটে দিয়েছে! ঈশ্বরের নাম কেটে দিয়েছে? চেঁচিয়ে উঠল সবাই।

—হ্যাঁ, তাই। কেন, দ্যাখোনি তোমরা?

দু-একজন অবশ্য দেখেছে, কিন্তু তার তাৎপর্যটা তারা বুঝতে পারেনি। সত্যিই তো, ক্রীশ্চানই যদি হবে তো নামটা ওভাবে কেটে দিয়েছে কেন?

চাকতিখানাকে একজন ছিনিয়ে নিল হঠাৎ। সবাই তার উপরে ঝুঁকে পড়ল। সেই আবছায়া-অন্ধকারের মধ্যেও দেখা গেল যে, ছুরির ফলা দিয়ে আড়াআড়িভাবে চাকতির উপরকার অক্ষরগুলিকে সব কেটে দেওয়া হয়েছে।

—কেন? এ-নাম তুমি কেটে দিয়েছ কেন? বারাব্বাসের উপরে তাদের প্রশ্নবাণ বর্ষিত হতে লাগল,—কী এর অর্থ? উত্তর দাও—। উত্তর দাও—। ও কি, চুপ করে রইলে কেন? বলো,—বলো?

বারাব্বাস তবু জবাব দিল না। দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে সে বসে রইল। যা-খুশি ওরা করুক, যা-খুশি ওরা বলুক,—সে কিছু বলবে না। কোনো কথারই সে আজ কোনো জবাব দেবে না। আর-সবাই ততক্ষণে অস্থির হয়ে উঠেছে। কে এই লোকটা, ক্রীশ্চান বলে যে নিজের পরিচয় দেয়? কে এ? কী পরিচয় এর? ক্রীশ্চান? অসম্ভব। বারাব্বাসের হাবভাবে তারা বিস্মিত হয়ে গিয়েছে।

অন্ধকার কারাকক্ষের আর-এক কোণে এক বৃদ্ধ বসে ছিলেন। কোনো ব্যাপারেই এতক্ষণ তিনি কোনো কথা বলেননি। কয়েকজন তাঁর কাছে গিয়ে সব খুলে বলল। শুনে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। ধীর পায়ে বারাব্বাসের কাছে এগিয়ে এলেন।

দীর্ঘ বলিষ্ঠদেহ পুরুষ। বয়েসের ভারে একটুবা ন্যুব্জ হয়ে পড়েছেন। শুভ্রশ্মশ্রু, শুভ্রকেশ। বলিষ্ঠ, তবু শান্ত। সবচাইতে আশ্চর্য তাঁর চোখদুটি। শৈশবের বিহ্বলতা আর বার্ধক্যের শান্তি এসে তার মধ্যে পাশাপাশি আশ্রয়লাভ করেছে। নীলাভ সেই চক্ষুর সরোবরে যেন অপূর্ব একটি প্রশান্তি রচিত হয়েছে।

একদৃষ্টিতে তিনি বারাব্বাসের দিকে, তার বেদনাবিদ্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বহুক্ষণ বাদে ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন তিনি। মনে হলো, বহুদিন বহু বছর আগেকার হারিয়ে-যাওয়া কী-একটা ঘটনা যেন তার হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছে।

—অনেক দিন, অনেক বছর আগে···। ভাল করে আজ আর তা আমার মনেও নেই···

বারাব্বাসের সামনেই তিনি তাঁর আসন গ্রহণ করলেন! তারপর কী-যেন স্মরণ করে তিনি আপনমনেই মাথা নাড়তে লাগলেন।

বাকী সবাই ততক্ষণে বিস্মিত হয়ে গিয়েছে। তাহলে কি উনি চেনেন? অদ্ভুত এই লোকটাকে উনি চেনেন?

চেনেন-যে তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই। তার সঙ্গে তিনি কথাবার্তা কইতেও শুরু করে দিয়েছেন। কোথায় ছিল সে এতদিন? কীভাবে ছিল? বারাব্বাস সব খুলে বলল তাঁকে। না, সব নয়। কিছু কিছু অংশ বাদ দিয়ে যতটুকু না-বললেই নয়, সেইটুকু মাত্রই সে তাঁকে জানাল। তিনিও তা বুঝলেন। বুঝলেন যে কিছু কিছু কথা সে তাঁর কাছে গোপন করে গেল। কিন্তু তাতে কি। যতখানি বলেছে, তাই কি যথেষ্ট নয়? এর আগে আর বারাব্বাস কখনো কাউকে বিশ্বাস করে কিছু বলেনি। এই প্রথম সে, যতটুকু পারে, আর-একজনের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করল। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে প্রায়-অস্ফুট শ্রান্ত গলায় সে সব বিবৃত করে গেল। কথাবার্তার মাঝে মাঝে সে তাঁর শান্ত-করুণ বিষণ্ণমধুর মুখখানির দিকে তাকাতে লাগল। তার নিজের মুখও বলিরেখাকীর্ণ। কিন্তু কই, ওঁর মুখের ওই উৎকীর্ণ বলিরেখার মধ্যে যে একটি প্রগাঢ় শান্তি ফুটে উঠেছে, বারাব্বাস তো কখনো তার সন্ধান পায়নি? ওঁর ললাট চিন্তাকুঞ্চিত, তবু শুভ্রসুন্দর। দাঁত পড়ে গিয়ে দু'গালে দুটি গহ্বর সৃষ্টি হয়েছে, তা সত্ত্বেও ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে ওঁকে। কথাবার্তার মধ্যে পরিচিত সেই ভাঙা-ভাঙা টানগুলিও ওঁর রয়ে গেছে এখনো। কিছুমাত্রও তার পরিবর্তন হয়নি।

কেনই বা বারাব্বাসের চাকতির উপরে ঈশ্বরের নাম কেটে দেওয়া হয়েছে, আর কেনই বা সে আগুন ধরিয়ে দিতে সাহায্য করেছিল সেদিন, সব কথাই সে তাঁকে খুলে বলল। বলল যে, এই পাপ-পৃথিবীকে ভস্মীভূত করবার জন্যেই সে খ্রীশ্চান-সমাজকে আর তাদের প্রভুকে সেদিন সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল। শুনে তাঁর সারামুখে অদ্ভুত একটু বেদনা ফুটে উঠল। ধীরে ধীরে তিনি মাথা

ড়তে লাগলেন। ছী-ছি, বারাব্বাস কি ভেবেছিল যে ও-আগুন ক্রীশ্চানরাই লাগিয়েছে? কী করে সে ভাবতে পারল? সে কি বুঝতে পারেনি যে, সমস্ত ব্যাপারটাই সীজারের একটা কারসাজি? ক্রীশ্চানদের উপরে নির্যাতন আরম্ভ করবার জন্যে সে একটা অজুহাত খুঁজে বেড়াচ্ছিল। ভাড়াটে জনকয়েক লোককে দিয়ে শহরে সে আগুন ধরিয়ে দেয়। দোষটা তারপর ক্রীশ্চানদের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। ক্রীশ্চানদের বারাব্বাস সাহায্য করতে চেয়েছিল, না-জেনে সে আসলে সীজারকেই সাহায্য করে বসেছে।

—তোমার চাকতির উপরে রাষ্ট্রের ছাপ মারা রয়েছে। সীজারই তোমার প্রভু। তোমার সেই মর্ত্যের প্রভুকেই তুমি সাহায্য করেছ, যাঁর নাম এখানে কেটে দেওয়া হয়েছে—তাঁকে নয়।

একটুক্ষণ তিনি থেমে রইলেন; তারপর বললেন:

—তিনি কখনো কারুর অনিষ্ট করেন না। তিনি করুণাময়। বলে তিনি বারাব্বাসের চাকতিখানাকে আবার হাতে তুলে নিলেন। কেটে-দেওয়া অক্ষরগুলির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দু-চোখে তার এক আশ্চর্য বেদনা ছড়িয়ে পড়ল। নীরবে তিনি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করলেন। এ-চাকতি বারাব্বাসের; যতদিন বেঁচে আছে, এ-চাকতি ওকে বহন করতে হবে। তা তিনি জানেন। কিছু আর তাঁর করবার নেই এখন। কোনোভাবেই আর ওকে তাঁর এখন সাহায্য করবার উপায় নেই। বারাব্বাসের দু-চোখে যে একটি ভীরু নিঃসঙ্গ দৃষ্টি ফুটে উঠেছে, তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর একসময় মনে হলো—বারাব্বাসও তা জানে।

—কে ও? কে?

উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর উপরে প্রশ্ন বর্ষিত হতে লাগল।

—কে ও? কী-ওর পরিচয়?

জবাব না দিয়ে তিনি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। মনে হলো প্রশ্নটাকে তিনি এড়িয়ে যেতে চাইছেন। কিন্তু তা সম্ভব হলো না। বিস্ময়ে কৌতূহলে সবাই ততক্ষণে অস্থির। শেষ পর্যন্ত তাঁকে বলতেই হলো।

—এ-ই সেই বারাব্বাস। আমাদের প্রভুর জীবনের বিনিময়ে একে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।

বারাব্বাস! স্তম্ভিত হয়ে গেল সবাই। বিমূঢ় আতঙ্কে তারা তার দিকে তাকিয়ে রইল।

—বারাব্বাস! এ-ই সেই বারাব্বাস! এ-ই! এ-ই! কোনো কিছুই যেন তারা ঠিক বুঝে উঠতে পারছেনা। কেউই না। আর সেই অন্ধকারের মধ্যে নিরুপায়-বীভৎস এক ক্রোধের বহ্নিতে তাদের চোখ জ্বলতে লাগল।

বৃদ্ধ তাদের শান্ত করলেন। বললেন:—এ-ক্রোধ অর্থহীন। লোকটা অসুখী, অশান্তির আগুনে ও এখন দগ্ধ হচ্ছে। আর তাছাড়া, ওকে যে আমরা নিন্দে করব, এখন অধিকার কি আমাদেরই আছে? নেই। আমরাই কি নিরপরাধ? না। অপরাধী আমরাও, ত্রুটিবিচ্যুতির আমাদের অবধি নেই। তা সত্ত্বেও যে ঈশ্বর আমাদের মার্জনা করেছেন, আমাদের এই কলঙ্ক-মলিন জীবনের উপরেও যে তাঁর করুণাবারি বর্ষিত হয়েছে, সে কৃতিত্ব আমাদের নয়, তাঁর। এ-লোকটির ঈশ্বর নেই; কিন্তু তাই বলেই কি আমরা একে নিন্দে করতে পারি? পারি না।

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল সবাই। যে-হতভাগ্যের ঈশ্বর নেই, বিশ্বাসের অগ্নিশিখায় যার সর্বপাপ এখনো ভস্মীভূত হয়নি, তার দিকে যেন আর তাদের তাকাবার পর্যন্ত সাহস নেই। ধীরে ধীরে যে-যার নিজের জায়গায় ফিরে গেল। বৃদ্ধও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করে তাদের অনুসরণ করলেন।

একা বারাব্বাস বসে রইল।

সূর্য ওঠে, সূর্য অস্ত যায়। বারাব্বাস জানে না। কারাকক্ষের সেই আধো-অন্ধকার নিঃসঙ্গ প্রান্তে দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে সে বসে থাকে। সারাদিন, সারা রাত্রি। ওদিকে ওরা গান গাইছে, সারা ঘরে তার সুরঝঙ্কার ছড়িয়ে গিয়েছে। সে-গান প্রত্যয়ের, সে-গান ভালবাসার। আর সেই প্রত্যয় আর ভালবাসার মধ্যেই সমস্ত জিজ্ঞাসার ওরা উত্তর খুঁজে পেয়েছে। জীবন-মরণের সীমানা ছাড়িয়ে যে-এক অনন্ত-জীবনের বেলাভূমি প্রসারিত হয়ে রয়েছে, তা ওরা

ওরা জানে, তাই নির্ভয়। মৃত্যুদণ্ডের আদেশ উচ্চারিত হয়েছে, কিন্তু তাতে কী? অনন্ত-জীবন ওদের সম্মুখে। তাই নিয়েই ওরা কথা কইছে এখন। মৃত্যুকে আর ওরা ভয় করে না।

ওদের গান, ওদের আলোচনা—সমস্ত কিছুই বারাব্বাস শুনতে পায়। সেও এখন চিন্তামগ্ন। কী হবে তার, কোথায় গিয়ে সে আশ্রয় পাবে,—বারাব্বাস ভাবে। মাউন্ট অব অলিভের সেই লোকটি, প্রভু যাকে পুনর্জীবন দিয়েছিলেন, তার কথা আজ আবার তার মনে পড়ল। তার সঙ্গে সেই একত্র-আহারের কথাও মনে পড়ল বারাব্বাসের। পুনর্জীবনলাভের পর আবারো তার মৃত্যু ঘটেছে। অন্তহীন অন্ধকারের মধ্যে গিয়ে সে তার আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে।

অনন্ত জীবন···

যে-জীবন অতিবাহিত করে এসেছে বারাব্বাস, কী অর্থ তার? কতটুকু অর্থ? অর্থহীন, অর্থহীন। না কি জানে না বারাব্বাস? সে কী করে বলবে।

শুভ্রশ্মশ্রু ওই বৃদ্ধ ওদিকে বসে আছেন। আর-পাঁচজনের সঙ্গে কথাবার্তা কইছেন। উচ্চারণের মধ্যে গ্যালিলির সেই ভাঙা-ভাঙা টানটা এখনো বুঝতে পারা যায়। এতটুকুও তার পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু কী আশ্চর্য, কথা কইতে কইতেই হঠাৎ এক একসময় তিনি নীরব হয়ে যাচ্ছেন। কী যেন ভাবছেন। নিজের জন্মভূমির স্মৃতি, গেনেসারেটের সমুদ্রতীরের স্মৃতিই হয়তো ওঁকে আজ উন্মনা করে তুলেছে। সেইখানে গিয়ে মরতে পারলেই তিনি হয়তো শান্তি পেতেন। কিন্তু না, তা আর হয় না। পথের প্রান্তে প্রভুর সঙ্গে যেদিন তাঁর দেখা হলো, তিনি শুধু বলেছিলেন, "আমাকে অনুসরণ করো।" সেই যে তাঁকে তিনি ঘরের থেকে বাইরে ডেকে আনলেন, তারপর আর ঘরে ফেরা হয়নি। পথেপথেই তিনি তাঁর অনুসরণ করে ফিরেছেন।···নীরবে তিনি বসে রইলেন। কৌতূহলে বিস্ফারিত ওই চক্ষু আর বলিরেখাকীর্ণ ওই ললাটে তাঁর এক পরম প্রশান্তি ফুটে উঠেছে।

তারপর একদিন ক্রুশবিদ্ধ করতে নিয়ে যাওয়া হলো তাদের। বন্দীরা সবাই জোড়ে-জোড়ে শৃঙ্খলিত। কিন্তু সব-মিলিয়ে সংখ্যাটা বেজোড়, বারাব্বাসকে

তাই আর অন্য-কারুর সঙ্গে একত্র-শৃঙ্খলিত করা হয়নি। ঘটনাচক্রে এই মৃত্যুর মুহূর্তেও সে একা। সবশেষে তাকে নিয়ে আসা হলো। যে-ক্রুশটিতে তাকে বিদ্ধ করা হলো, সেটিও একেবারে প্রান্তবর্তী।

চতুর্দিক লোকে লোকারণ্য। শহরশুদ্ধ লোক আজ তাদের মৃত্যুযন্ত্রণা প্রত্যক্ষ করতে এসেছে। কিন্তু আশ্চর্য, মৃত্যুর সেই মর্মান্তিক যন্ত্রণার মধ্যেও তাদের বিশ্বাসে এতটুকু চিড় খায়নি। কী-এক পরম আশ্বাসে পরস্পরের সঙ্গে তারা কথা কইছে, পরস্পরের মধ্যে তারা সেই আশ্বাসের আনন্দ সঞ্চারিত করে দিচ্ছে।

বারাব্বাসের সঙ্গেই শুধু কেউ কথা কইল না। তখনো বারাব্বাস একা।

সন্ধ্যার একটু আগেই যে-যার বাড়ি চলে গেল। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সবাই অধৈর্য হয়ে উঠেছিল। আর তা ছাড়া বন্দীরাও ততক্ষণে মারা গিয়েছে।

একমাত্র বারাব্বাসই তখনো জীবিত। সন্ধ্যার সেই স্তব্ধবিষণ্ণ নির্জনতার মধ্যে সে যখন বুঝতে পারল, যে-মৃত্যুকে সে সর্বক্ষণ ভয় করে এসেছে, সেই মৃত্যুই এবারে সমাসন্ন, অন্ধকারের মধ্যে সে তখন বলল :

—তোমার হাতেই আমার আত্মাকে আমি সমর্পণ করলাম। মনে হলো যেন সেই নিবিড় তমিস্রার সঙ্গেই সে কথা কইছে।

বারাব্বাস মারা গেল।